নীল মানুষ

হুমায়ূন আহমেদ

For more book free download go to www.missabook.com

বাতাস হ'য়েছে মুগ্ধ; — বাতাসের পিছনে সাগর
চলিতেছে; — স্নিগ্ধ করিতেছে গিয়ে হৃদয়ের জ্বর
শুদ্ধ শাদা বরফের কোনো এক শীতল পাহাড়ে!

নেক্‌ড়েরা দল বেঁধে নামে না সে পর্ব্বতের ধারে,
অন্ধকারে শেয়ালেরা সেখানে ওঠে না কেঁদে আর,
তীরের ফলার মত পৃথিবীর আলো-অন্ধকার
সেইখানে বেঁধে না ক' পাইনের পাতাদের বুক
হিম রাতে! — কিন্তু সেই পাহাড়ের শিশিরের শীতে
ফ'লেছে সবুজ শাখা — সেইখানে ফ'লেছে নিভৃতে
কাঁচা পাতা; — জ্বর ছেড়ে গেছে তার; — নক্ষত্র শীতল
সেইখানে; — নক্ষত্রের মত সুস্থ সমুদ্রের জল—!

— জীবনানন্দ দাশ

For more book free download go to www.missabook.com

জলি আবেদিন

আড়ালে তাঁকে আমি ডাকি
সিস্টার টুয়েন্টি টু ক্যারেট।
কারণ তাঁর হৃদয় বাইশ ক্যারেট সোনায় বানানো—
কোনো খাদ নেই।

দরজা ধরে কে যেন দাঁড়িয়েছে।

ফরহাদ উদ্দিন বসে আছেন খাটে। তাঁর পিঠ দরজার দিকে তবু তিনি স্পষ্ট বুঝলেন তাঁর পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি খুবই অবাক হলেন— চোখে না দেখেও কী করে বোঝা যাচ্ছে? এমন তো না, যে দাঁড়িয়ে আছে তার ছায়া এসে ঘরে ঢুকেছে। কিংবা সে শব্দ করছে, নিঃশ্বাস ফেলছে। তিনি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনছেন। তিনি কিছুই শুনছেন না। যে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ের গন্ধও পাচ্ছেন না। কারণ ফরহাদ উদ্দিন সাহেবের ঘ্রাণশক্তি নেই। গত পনেরো বছর ধরে তিনি কোনো কিছুর গন্ধ পান না। একবার কাগজি লেবু চিপে তার কিছু রস তিনি নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। নাক জ্বালা করেছে, তিনি কোনোই গন্ধ পান নি।

একজন কেউ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে দেখছেন না, তার গায়ের কোনো ঘ্রাণ পাচ্ছেন না। সে কোনো শব্দও করছে না, অথচ ফরহাদ উদ্দিন সাহেব তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন।

তাঁর কাছে এই ঘটনার জন্যে জগৎ খুব রহস্যময় মনে হলো। ফরহাদ উদ্দিনের কাছে মাঝে মাঝে অনেক তুচ্ছ কারণেও জগৎ রহস্যময় মনে হয়। আজকের কারণটা তেমন তুচ্ছ না।

ফরহাদ উদ্দিনের হাতে খবরের কাগজ। আজ ছুটির দিন। তিনটা বাজে। খবরের কাগজ সকালেই পড়া হয়েছে। এখন আবারো পড়ছেন, কারণ তিনি লক্ষ করেছেন খবরের কাগজ দ্বিতীয়বার পড়ার সময় অনেক ইন্টারেস্টিং খবর চোখে পড়ে যা প্রথমবারে চোখ মিস করে যায়। এই যেমন এখন তিনি দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা খবর পড়ছেন। সকালবেলা এই খবর চোখেই পড়ে নি— 'কাঁঠাল খেয়ে একই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু।' নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানিয়েছেন— গাইবান্ধার রসুলপুরের জনৈক মজনু মিয়ার পরিবারে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মজনু মিয়া সকালে নিজের বাড়ির পেছনের কাঁঠাল গাছ থেকে একটা পাকা কাঠাল পেড়ে এনে সবাই মিলে আরাম করে খেয়েছে।

For more book free download go to www.missabook.com

খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত বমি এবং মৃত্যু।

আশ্চর্যজনক সংবাদ তো বটেই। বৃক্ষের ফল কি বিষাক্ত হতে শুরু করেছে? টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানিতে এখন আর্সেনিক। গাছের ফলফলাদিতেও কি আর্সেনিকের মতো বিষাক্ত কিছু জমতে শুরু করেছে? শেষ বিচারের দিন কি কাছে এসে গেছে? শেষ বিচারের দিন কাছাকাছি চলে এলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটবে। মাটির নিচ থেকে একটা বিকটাকার কুৎসিত প্রাণী বের হয়ে মানুষের ভাষায় কথা বলবে, গাছের ফলফলাদি বিষাক্ত হয়ে যাবে, পানির মধ্যে চলে আসবে তিক্ত স্বাদ...।

ব্যাপারগুলি নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। দরজা ধরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে আলাপ করা যায়। ফরহাদ উদ্দিন এখন জানেন কে দাঁড়িয়ে আছে— কনক। মেয়েটার চুপি চুপি দরজা ধরে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে। পাখি স্বভাব মেয়ে। পাখি যেমন জানালায় বসে থাকে, কেউ তার দিকে তাকালেই উড়ে যায়— কনক মেয়েটাও সে-রকম। ঘাড় ঘুরিয়ে ফরহাদ উদ্দিন তার দিকে তাকালেই সে সরে যাবে। তবে একেবারে চলেও যাবে না। দরজার আশেপাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কনক ফরহাদ উদ্দিনের বন্ধু বদরুল পাশার মেয়ে। এক মাস হলো মেয়েটা এই বাড়িতে আছে। আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে অথচ শিশুদের মতো ভাব ভঙ্গি। পাখি স্বভাবের মেয়ে এরকম হয়, কিছুতেই তাদের শৈশব কাটে না। মেয়েটার উপর ফরহাদ উদ্দিনের খুবই মায়া লেগে গেছে। আর মায়া এমন জিনিস একবার যদি লেগে যায় তাহলে সর্বনাশ, মায়া বাড়তেই থাকে।

কনক!

জ্বি।

সঞ্জু বাসায় আছে কিনা একটু দেখে আস। তাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। ঠিক সাড়ে তিনটার সময় বের হবো। তাকে মনে করিয়ে দিয়ে আস।

ফরহাদ উদ্দিন লক্ষ করলেন মেয়েটা যাচ্ছে না। এখনো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে। তিনি খবরের কাগজে মন দিলেন। এখন পড়ছেন কর্মখালি বিজ্ঞাপন। তাঁর কর্মখালি বিজ্ঞাপন পড়ার কোনো কারণ নেই। তবু কেন জানি এই বিজ্ঞাপনগুলি পড়তে ভালো লাগে। তাঁর প্রয়োজন না থাকলেও সঞ্জুর প্রয়োজন পড়বে। ছ'মাসের মধ্যে তার রেজাল্ট হয়ে যাবে। চাকরি খোঁজা শুরু। চাকরির বাজার কেমন— আগেভাগে দেখা থাকলে ভালো।

কনক!

==========

জ্বি।

দেখি মা আমাকে এক কাপ চা খাওয়াও তো।

আচ্ছা।

চিনি দিও না কিন্তু। আমার ডায়াবেটিস মারাত্মক পর্যায়ে চলে গেছে। চিনি খাওয়া আর বিষ খাওয়া আমার জন্যে একই। এক চামচ চিনি মানে এক চামচ বিষ।

কনক এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আজ মনে হয় সে দরজার পাশ থেকে নড়বে না। মেয়েটা মাঝে মাঝে এরকম করে— কোনো কথাই শোনে না। চা বানিয়ে না আনলেই ভালো হয়। ফরহাদ উদ্দিনের চায়ের পিপাসা পায় নি। মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্যে কথা বলা। মায়া পড়ে গেলে যা হয়। যার উপর মায়া পড়েছে তার সঙ্গে শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছাটিই বিপজ্জনক। কথা বলা মানেই মায়া বাড়ানো।

ফরহাদ উদ্দিন ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। এই নিঃশ্বাস কনক মেয়েটার জন্যে। মেয়েটা পড়ে গেছে আউলা ঝাউলার মধ্যে। বদরুলের মেয়ে আউলা ঝাউলার মধ্যে পড়বে এটা জানা কথা কিন্তু এতটা যে পড়বে তা ফরহাদ উদ্দিন নিজেও ভাবেন নি। কনকের বয়স যখন সাত বছর— বদরুল নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেই নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাও অদ্ভুত। বদরুল একদিন হঠাৎ অফিস কামাই দিয়ে বাসায় এসে উপস্থিত। হাতে বিরাট সাইজের একটা ইলিশ মাছ। তার না-কি হঠাৎ সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা করছে। ঘরে সর্ষে ছিল না। মাছ রেখে সে গেল সর্ষে কিনতে। এই যে গেল আর ফিরল না। তাকে খোঁজার চেষ্টা কম করা হয় নি। হাসপাতালে খোঁজ নেয়া হয়েছে। মর্গে খোঁজ নেয়া হয়েছে, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামে খোঁজ নেয়া হয়েছে— কোনো লাভ হয় নি।

ফরহাদ উদ্দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বদরুলের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার সোহাগীতে গিয়েছেন। তাঁর ক্ষীণ সন্দেহ ছিল— বদরুল হয়তো তার গ্রামের বাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। বদরুলের যে স্বভাব তার জন্যে এটা বিচিত্র কিছু না। গ্রামের বাড়িতে তাকে পাওয়া গেল না, তবে কিছুদিন পরপরই উড়ো খবর পাওয়া যেতে লাগল। একজন তাকে দেখেছে মুন্সিগঞ্জে এক চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে। একজন তাকে দেখেছে আজমীর শরীফে খাজা বাবার দরগায়।

কনকের মা সাবেরা বেগম মেয়েকে নিয়ে পড়ল মহা বিপদে। একজন মানুষ মরে যাওয়া এক কথা আর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অন্য কথা। মৃত মানুষের

==========

ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। নিখোঁজ মানুষের সে সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুতি থাকতে হয়।

সাবেরা বেগম ছয় মাসের মতো বদরুলের ভাড়া করা বাড়িতে থাকল। তারপর সংসার গুটিয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে গেল। ভাইয়ের বাসায় বেশি দিন থাকা গেল না। থাকার কথাও না। ঢাকা শহরে একটা পুরো পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার মতো মানুষ বেশি নেই। শুরু হলো সাবেরা বেগমের যাযাবর জীবন। এর বাড়িতে কিছুদিন। চার মাস পর আরেক বাড়িতে কিছুদিন। মাঝে মাঝে ফরহাদ উদ্দিন তাদের দেখতে যান। সাবেরা বেগম কাঁদো কাঁদো গলায় বলে— ভাই সাহেব, একটা কিছু বুদ্ধি দেন তো। আমি কী করব ? পড়াশোনাও জানি না যে চাকরি বাকরি করব। আয়ার চাকরি করতে পারি কিন্তু মেয়েটাকে রাখব কোথায় ? মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন। আগুনের মতো রূপ হয়েছে— তার বাপ আমাকে যে যন্ত্রণায় ফেলেছে এই মেয়ে তারচে দশগুণ যন্ত্রণায় আমাকে ফেলবে।

তারপর একদিন শুনলেন কনকের মা'র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ধর্মের দিক থেকে এই বিয়ে শুদ্ধ। যে সময় পর্যন্ত স্বামী নিখোঁজ থাকলে বিয়ে বাতিল হয়ে যায় বদরুল তার চেয়েও অনেক বেশি সময় ধরে নিখোঁজ। সাত বছর তিন মাস। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেই ছেলে কী একটা এনজিওতে কাজ করে। ভালো বেতন পায়। ফরহাদ উদ্দিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক সব রক্ষা হয়েছে। একদিন ওদের নতুন সংসার দেখতে গেলেন। দেখে মুগ্ধই হলেন। বেশ সুন্দর গোছানো ছিমছাম সংসার। ঘরে টিভি, ফ্রিজ আছে। নতুন সোফা সেট। কনকের সৎবাবা ঘরে ছিল না, তবে বসার ঘরে কনকের মা'র সঙ্গে তোলা দু'জনের ছবি দেখলেন। ভদ্রলোকের কেমন যেন গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা। রাগী রাগী চোখ। বদরুল পাশার একেবার বিপরীত। বদরুলের ছিল ঠাণ্ডা চেহারা। যখন হাসত তখন মনে হতো সারা শরীর দিয়ে হাসছে। নিজে হাসত অন্যকে হাসাত। ছবির এই ভদ্রলোক সে-রকম হবে না। তাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবীতে একেকজন মানুষ একেক রকম। কেউ হাসবে, কেউ রাগী চোখে ঠোঁট মুখ শক্ত করে তাকিয়ে থাকবে।

সাবেরা বেগম চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কোনো উপায় না দেখে বিয়েতে রাজি হয়েছি। ভাই, আপনি আমার উপর রাগ করবেন না।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ছিঃ ছিঃ ভাবি। আমার রাগ করার কথা আসছে কেন ? আপনি যা করেছেন ভালোই করেছেন।

==========

আমার শুধু ভয় লাগছে এখন যদি কনকের বাবা ফিরে আসে তাহলে কী হবে ?

আসুক ফিরে তারপর দেখা যাবে।

আমার মন বলছে ফিরে আসবে। যখনই এটা মনে হয় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ভাই, আপনি সব সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমি দুঃখী একটা মেয়ে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ভাবি আমি অবশ্যই যোগাযোগ রাখব।

ফরহাদ উদ্দিন যোগাযোগ রেখেছেন।

গত মাসে হঠাৎ একদিন কনকের মা তাঁর অফিসে টেলিফোন করলেন— খুবই প্রয়োজন, তিনি যেন পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও তাদের বাসায় আসেন। সম্ভব হলে আজই। তিনি সেদিনই অফিস শেষ করে গেলেন ।

সাবেরা বেগম ফরহাদ উদ্দিনকে দেখে অকূলে কূল পেয়েছেন এরকম ভাব করলেন। ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ভাবি কেমন আছেন ? অনেক দিন পরে কথা হচ্ছে। নতুন টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেয়েছেন ? তার আগে বলেন, আপনি আছেন কেমন ?

সাবেরা বেগম বললেন, বেশি ভালো না। ভাই সাহেব, আপনি আমার ছোট্ট একটা উপকার করবেন ? ছোট্ট উপকার না, আসলে বড় উপকার।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, অবশ্যই করব। কী করতে হবে বলুন।

ছয়-সাত দিনের জন্যে আমার মেয়েটাকে আপনার বাসায় রাখবেন। আমি ওর দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি। আমি কনককে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না। বুঝতেই তো পারছেন— গ্রাম দেশ, নানান জনে নানান কথা বলবে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, বদরুলের মেয়েকে এক সপ্তাহের জন্যে নিজের বাসায় নিয়ে রাখব এটা কোনো ব্যাপারই না। আপনি বলুন কবে এসে নিয়ে যেতে হবে— আমি সেদিনই আসব।

আবার কবে আসবেন, না আসবেন— আজই নিয়ে যান। ভাই সাহেব, আপনার পায়ে পড়ি। আমার এই উপকারটা আপনি করেন। আমি কনকের স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। সাতটা দিন একটু কষ্ট করেন।

ফরহাদ উদ্দিন অবাকই হলেন। এত তাড়াহুড়া কেন বুঝতে পারলেন না। তিনি কনককে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলেন। কথা নেই বার্তা নেই বন্ধুর মেয়ে নিয়ে উপস্থিত হওয়াটা রাহেলা কী চোখে নেবে কে জানে। মেয়েটা থাকবেই বা কোন ঘরে। বাড়তি ঘর তো নেই। কনক থাকবে কোথায় ? ভালো সমস্যা হলো তো!

==========

তিনি যে-রকম ভেবেছিলেন সে-রকম কিছু হলো না। রাহেলা অবাক হয়ে বললেন— এই মেয়েকে তো আমি ছোটবেলায় দেখেছি। সে তো তখন এত সুন্দর ছিল না। এখন এত সুন্দর হয়েছে কীভাবে। এই মেয়ে তুমি কী সাবান মাখ ?

কনক কোনো জবাব দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তবে তার মুখ দেখে মনে হলো— এতক্ষণ একটা ভয়ের মধ্যে সে ছিল, এখন এই ভয় তার কেটে গেছে।

রাহেলা বললেন, তুমি তাস খেলতে জানো ?

কনক না-সূচক মাথা নাড়ল।

রাহেলা বললেন— তাস খেলা শিখে নিও। আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে মজা করে তাস খেলি। বড় মেয়েটা খেলতে চায় না। কিছুক্ষণ তাস খেললেই তার নাকি মাথা ধরে। তুমি তাস খেলা শিখে নিলে আমাদের প্লেয়ারের সর্ট হবে না।

কনক হেসে ফেলল। সেই হাসি দেখে ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো মেয়েটা অনেক দিন এরকম হাসার সুযোগ পায় নি। তাঁর মনটা মায়ায় ভরে গেল।

রাহেলা বললেন— শোন মেয়ে, তুমি তোমার চাচার ঘরে ঘুমুবে। একা একা ঘুমুতে ভয় পাবে এই জন্যে নীতু ঘুমাবে তোমার সঙ্গে। আর তোমার চাচা যখন খবরাখবর না নিয়ে হুট করে তোমাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তার শাস্তি হিসেবে ড্রয়িংরুমের সোফায় ঘুমুবে। আমি আমার ঘরে তাকে জায়গা দেব না। এমন নাক ডাকে আমি এক সেকেণ্ডের জন্যেও ঘুমুতে পারি না।

এক সপ্তাহ পর তিনি কনককে তার মা'র কাছে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কনকের মা, তার স্বামীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় ইমিগ্রেশন নিয়ে চলে গেছে। খবরটা তারা গোপন রেখেছে। কেউই কিছু জানে না।

ফরহাদ উদ্দিন কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মা তুমি জানতে ওরা বিদেশে চলে যাবে ?

কনক হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তোমাকে কি আমার কাছে ফেলে গেছে ?

কনক আবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

ফরহাদ উদ্দিন ভীত গলায় বললেন, এখন কী করা যায় বলো তো মা ? রাহেলা এই খবর শুনলে কী করবে কে জানে। কেন জানি মনে হচ্ছে, সে খুবই রেগে যাবে। আমার তো খুবই ভয় লাগছে। তোমার ভয় লাগছে না ?

==========

কনক বলল, না।

ভয় লাগছে না কেন ?

চাচিজি সব জানেন।

চাচিজি সব জানেন মানে কী ? রাহেলা কী জানে ? তোমার মা যে তোমাকে আমার ঘাড়ে ফেলে চলে গেছে এটা জানে ?

হুঁ। তাকে বলেছি।

আমাকে বলো নি কেন ?

কনক অন্যদিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। যেন মানুষটাকে বোকা বানিয়ে সে মজা পাচ্ছে। এই মেয়েও তার বাবার মতো অদ্ভুত হচ্ছে কিনা কে বলবে। মনে হয় হচ্ছে। পিতার স্বভাব কিছু না কিছু তো পাবেই।

ফরহাদ উদ্দিন খুবই আবাক হলেন।

কনক সহজ গলায় বলল, চাচাজি আমি একটা আইসক্রিম খাব।

তিনি আইসক্রিম কিনে আনলেন। তাঁর কাছে মনে হলো মেয়েটাকে তার মা ফেলে রেখে গিয়ে ভালোই করেছে।

চাচাজি আপনার চা।

কনক চা এনে রেখেছে। ফরহাদ উদ্দিন চায়ে চুমুক না দিয়েই বললেন, অসাধারণ চা হয়েছে মা। সাধারণের আগে একটা অ বসেছে। একটা অ না বসে দুটা বসলে ভালো হতো— অঅসাধারণ চা। তুমি চলে যাচ্ছ কেন ? বোস, গল্প করি। আমার হাতে এখনো বার তের মিনিট সময় আছে।

কনক বসল না, খাট ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আমার চায়ের নেশা নেই। চায়ের নেশা ছিল তোমার বাবার। চায়ের দোকান দেখলেই চা খেতে দাঁড়িয়ে যাবে। সে কী ঠিক করেছিল জানো ? সে ঠিক করেছিল ঢাকা শহরে যত চায়ের দোকান আছে সব দোকানে সে চা খাবে। তারপর যে দোকানের চা সবচে' ভালো তাকে আধভরি ওজনের একটা গোল্ড মেডেল দেবে। মেডেলের নাম 'বদরুল পাশা টি মেডেল'। তোমার বাবার পাল্লায় পড়ে কত দোকানের চা যে খেয়েছি।

মেডেল দেয়া হয়েছিল ?

না দেয়া হয় নি। তোমার বাবার কোনো শখই বেশিদিন থাকে না। একটা জিনিস ধরে, কিছুদিন এটা নিয়ে কচলাকচলি করে তারপর ছেড়ে দেয়। একবার কী করল শোন, কোত্থেকে খবর নিয়ে এলো কুড়ি বছর যদি কেউ মিথ্যা না বলে

==========

তাহলে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হয়। তার মনের সকল ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয়। তোমার বাবা মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। তোমার বাবার পাল্লায় পড়ে আমিও মিথ্যা বলা ছেড়ে দিলাম। সে তার স্বভাব মতো তিন মাস পরে বলল— আরে দূর, মিথ্যা না বলে মানুষ থাকতে পারে! মানুষের জন্মই হয়েছে ফিফটি পার্সেন্ট সত্য বলার জন্যে আর ফিফটি পার্সেন্ট মিথ্যা বলার জন্যে।

আপনিও কি বাবার মতো ছেড়ে দিলেন ?

না আমি ছাড়ি নি। বিশ বছর হতে আর বেশি বাকিও নেই। আগামী ডিসেম্বরে হবে। তখন একটা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হবে।

আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কী ?

মনের শক্তি। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হলে আমি যা ইচ্ছা করব তাই হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি— কথার কথা আর কী। মনে কর, আমার খুব ইচ্ছা সঞ্জুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। কিন্তু সঞ্জু এটা চাচ্ছে না। যেহেতু আমি ইচ্ছা করেছি বিয়ে হবেই। সঞ্জু যদি নাও চায় তারপরেও হবে।

কনক ক্ষীণ গলায় বলল, সঞ্জু ভাইয়ার একজন পছন্দের মেয়ে আছে, তার নাম রিনি। সঞ্জু ভাইয়া উনাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

ফরহাদ উদ্দিন আনন্দিত গলায় বললেন, ডিসেম্বর মাস পার হবার পর আর পারবে না। তখন আমার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। আমার যে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তা তো তুমি জানো। তখন যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে ঘ্রাণশক্তি ফিরে আসবে।

কনক এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এখন বসল। তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে খুবই মজা পাচ্ছে।

মেয়েটার সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু আর সময় নেই। সঞ্জুকে নিয়ে বের হতে হবে।

ফরহাদ উদ্দিনের খুব ইচ্ছা সঞ্জুর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তাকে এ বাড়িতেই রেখে দেন। এরকম ভালো একটা মেয়ে অথচ সঞ্জু তার দিকে ফিরেও কেন তাকাচ্ছে না সেটা একটা রহস্য। ঠিক মতো কয়েকবার তাকালেই মায়া লেগে যেত। একবার মায়া লেগে গেলে আর চিন্তা ছিল না। ফরহাদ উদ্দিন অবশ্য নিজের মতোই চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যখন তখন কনককে সঞ্জুর কাছে পাঠাচ্ছেন। টুকটাক কথা হতে হতে দেখা যাবে মায়া লেগে গেছে। মায়া লাগার জন্যে কথা চালাচালি করা খুবই জরুরি।

কনক!

==========

জ্বি ।

সঞ্জুর ঘরে একটু যাও তো। ওকে বলো কাপড় পরতে, আমরা এখন রওনা হব।

উনার ঘরে ঢুকলে উনি রাগ করবেন।

তাহলে দরজা থেকে বলো।

কনক উঠে দাঁড়াল। ফরহাদ উদ্দিন আবারো একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। কী সুন্দর মেয়ে। সঞ্জুর আশেপাশে এরকম সুন্দর মেয়ে ছাড়া কি কাউকে মানায় ? কাউকে মানায় না।

ছেলের সঙ্গে রিকশায় করে অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। ফরহাদ উদ্দিন দ্রুত মনে করার চেষ্টা করলেন— শেষ কবে সঞ্জুকে নিয়ে রিকশায় উঠেছেন। মনে পড়ল না। শেষবার কবে সঞ্জুকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছেন সেটা মনে পড়ল। গত বৎসর মে জুন মাসের দিকে। ঢাকা থেকে ট্রেনে করে চিটাগাং গিয়েছিলেন। আন্তনগর ট্রেন। ফার্স্ট স্টপেজ ছিল ভৈরব। ভৈরবে দু' টাকার কালোজাম কিনলেন। এত মিষ্টি কালোজাম তিনি জীবনে খান নি। পাঁচ টাকার এক ঠোঙা কেনা উচিত ছিল। বিরাট ভুল হয়েছে।

পুরনো ঘটনা আজকাল আর চট করে মনে পড়ে না। যেটা মনে করতে চান সেটা না পড়ে অন্য ঘটনা মনে পড়ে। ফরহাদ উদ্দিনের ধারণা ডায়াবেটিসের কারণে এটা হয়েছে। ডায়াবেটিস এমন এক রোগ যে শরীরের সব কলকব্জায় জং ধরিয়ে দেয়, মরচে পড়ে যায়। সবার আগে মরচে ধরে মাথায়। কোনো কিছুই ঠিকঠাক মনে পড়ে না। তিনি শেষ কবে সঞ্জুকে নিয়ে রিকশায় উঠেছিলেন সেটা মনে পড়ল না— ট্রেনের কথা মনে পড়ে গেল। যে লোক কালোজাম বিক্রি করছিল তার চেহারা পর্যন্ত মনে পড়ল। থুতনিতে দাড়ি, মাথায় বেতের টুপি। পান খাচ্ছিল। পানের রস গড়িয়ে দাড়িতে পড়েছে। ধবধবে সাদা দাড়ি বেয়ে পানের লাল পিক নামছে— এটাও মনে আছে।

সঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলে হয়— সঞ্জু, শেষ কবে তোকে নিয়ে রিকশায় উঠেছি ?

ফরহাদ উদ্দিনের সাহসে কুলাচ্ছে না। তাঁর মন বলছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই সঞ্জু রেগে যাবে। কপালের রগ ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে, শেষ কবে তোমার সঙ্গে রিকশায় উঠেছিলাম তা দিয়ে দরকার কী ?

রেগে গেলে সঞ্জুর কপালের রগ ফুলে যায় এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

==========

মানুষের কপালে যে রগ আছে এটাই তিনি জানতেন না। নিজের ছেলেকে রাগত অবস্থায় দেখার আগ পর্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল মাথার খুলির ওপর সলিড চামড়ার একটা লেয়ার থাকে। এখন তিনি জানেন ঘটনা তা না। কপালের ঠিক মাঝখানে দু'টা রগ আছে। কোনো কোনো মানুষ রেগে গেলে এই রগ দু'টা ফুলে উঠে। ফরহাদ উদ্দিন আড় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলের দিকে মানে ছেলের কপালের দিকে। রগ ফুলে আছে কি-না তার একটা গোপন পরীক্ষা। নাহ্ রগ ফুলে নেই। তবে সঞ্জুর মুখ থমথমে। তিনি হাসি হাসি মুখে বললেন, এ জার্নি বাই রিকশা— কেমন লাগছে রে সঞ্জু ?

সঞ্জু জবাব দিল না। আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বসে রইল। ছেলের গম্ভীর মুখ দেখে ফরহাদ উদ্দিনের সামান্য ভয় ভয় করতে লাগল। এই তাঁর আরেক সমস্যা হয়েছে— অকারণ ভয়। অফিসে বড় সাহেব যখন ডাকেন বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠে। অথচ বুকে ধ্বক করার কোনো কারণ নেই। অফিসের বড় সাহেব আর্মির এক্স কর্নেল হাবীবুর রহমান অতি ভদ্রলোক। তিনি না হেসে কারো সঙ্গেই কথা বলেন না। পাঞ্জাবিপরা হাবীবুর রহমান সাহেবকে দেখে মনেই হয় না তিনি আর্মির কর্নেল ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় কোনো প্রাইভেট কলেজের মাই ডিয়ার টাইপ বাংলার প্রফেসর। অথচ এই ভদ্রলোকের চোখের দিকে পর্যন্ত তিনি তাকাতে পারেন না। তাঁর বুক শিরশির করে। একবার বড় সাহেব কী একটা কাজে তাঁকে ডেকেছেন। তিনি ভয়ে আধমরা হয়ে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন। বড় সাহেব হাসি মুখে বললেন— কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? বসুন। ফরহাদ উদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন। চেয়ারটা যে দুই ফুটের মতো পেছন দিকে সরানো সেটা মনে থাকল না। তিনি ধপাস করে কার্পেটে পড়ে গেলেন। এটাও হয়তো ডায়াবেটিসের কারণে হচ্ছে। খুব সম্ভব অসুখটা সাহসও কমিয়ে দেয়। মানুষ ভীরু টাইপ হয়ে যায়।

নিজের বাড়ির লোকজন ছাড়া তিনি এখন সবাইকে ভয় পেতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে সঞ্জুকে। তার মানে কি এই যে সঞ্জু এখন বাইরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে ? কয়েকদিন আগে বাসে উঠলেন, কন্ডাকটারের দিকে তাকিয়ে ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে গেল। এই বুঝি কন্ডাকটার কোনো তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করবে, তারপর এক পর্যায়ে চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। এরকম ঘটনা যে ঘটছে না, তা-না। ঘটছে। গত মাসেই ইত্তেফাক পত্রিকায় উঠেছে— 'চলন্ত বাস হইতে বৃদ্ধ নিক্ষেপ। কন্ডাকটার পলাতক।' পুরো খবরটা পড়তে পারেন নি। শেষ পৃষ্ঠায় নিউজটা ছিল। সেখানে

==========

কয়েক লাইন ছাপা হয়েছে, নিচে লেখা— পাঁচের পাতায় দেখুন। পাঁচের পাতায় কিছু নেই। অন্য কোনো পাতায় ছাপা হয়েছে ভেবে তিনি পুরো পত্রিকাটা পড়েছেন। কোথাও নেই।

ফরহাদ উদ্দিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কলিং বেলে হাত রাখতে গিয়েও ভয়ে মিইয়ে যান। বুক সামান্য ধ্বক ধ্বক করতে থাকে। মনে হয় বাড়ি এত চুপচাপ কেন ? কোনো দুর্ঘটনা কি ঘটেছে! তাঁর তিন মেয়ের কেউ কি বাথরুমে স্লীপ খেয়ে পড়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছে ? মাথায় আঘাত লাগা ভয়ংকর ব্যাপার। ব্রেইনে রক্তপাত হয়— বিরাট গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর অফিসের এক কলিগের স্ত্রীর এরকম হয়েছে। সাবান পানিতে পিচ্ছিল হওয়া বাথরুমে উল্টে পড়ে মাথায় ব্যথা। সবাই ভাবল তেমন কিছু না। ভদ্রমহিলা রাতে দুবার বমি করে স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমুতে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে বললেন— তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এই সব ভেবে ঘরে ফেরার সময় ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে যায়। অথচ দরজা খুললে বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় পরিস্থিতি খুবই ভালো। তাঁর তিন মেয়ে মায়ের সঙ্গে তাস খেলছে। টাকা দিয়ে খেলা হচ্ছে। সবার সামনেই দু' টাকার চকচকে নোট। রাহেলা তাঁকে দেখে বলে— আজ খেলা বন্ধ। তোর বাবাকে চা দিতে হবে। তখন এক মেয়ে বলে— এইসব হবে না মা। আমি এখন পর্যন্ত একটা ডিলও পাই নি। বাবাকে বুয়া চা দেবে। তোমাকে আরো পাঁচ ডিল খেলতে হবে। খুবই আনন্দময় পরিবেশ।

এখনো ভয়ে তিনি কুঁকড়েই আছেন। আড় চোখে বারবার সঞ্জুর কপাল দেখতে চেষ্টা করছেন। কপাল দেখতে গিয়ে ছেলেকে দেখা হয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর ছেলে! গায়ের রং সুন্দর। স্বাস্থ্য ভালো। মাথা ভরতি চুল। বাতাসে মাঝে মাঝে কিছু চুল কপালে এসে পড়ছে, সে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে। জরির পোশাক পরিয়ে মাথায় একটা মুকুট দিয়ে দিলেই রাজপুত্র। কিংবা একটা নীল রঙের স্যুট পরিয়ে গলায় টাই দিয়ে দিলে বিলেত ফেরত সাহেব পুত্র। এরকম ছেলেকে পাশে বসিয়ে রিকশায় ঘুরতেও আনন্দ। তিনি ছেলের হাত ধরলেন। সঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, হাত ধরবে না তো বাবা।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আচ্ছা।

একটু সরে বোস না। গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছ। এমনিতেই গরমে বাঁচি না।

ফরহাদ উদ্দিন সরে বসলেন।

হালকা গলায় বললেন, কনক মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে রে।

==========

সঞ্জু বলল, কোনো রকম লাগে না।

খুবই দুঃখী মেয়ে। লাজুক, পাখি স্বভাব। অন্তরটা টলটলা পানির মতো। মাশাল্লাহ্। এরকম মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

সঞ্জু বলল, বাবা কথা বলতে বলতে তুমি আবারো আমার দিকে আসছ।

ফরহাদ উদ্দিন সরে বসলেন। রিকশা বেশ দ্রুত চলছে। চৈত্রমাস— রাস্তা তেতে আছে। কানের পাশ দিয়ে গরম বাতাস বইছে। নাকের ভেতর সামান্য জ্বালা করছে। শুক্রবার ছুটির দিন, রাস্তায় যানজট নেই। ফরহাদ উদ্দিন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, চৈত্র মাসের গরমের একটা মজা আছে এটা কি তুই লক্ষ করেছিস ?

সঞ্জু বলল, কী মজা ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, সব সিজনেরই আলাদা আলাদা মজা আছে। পৌষ মাসে যখন জাঁকিয়ে শীত পাড়ে সেই শীতের মজা আছে। আবার চৈত্র মাস যখন তালু ফাটা গরম পড়ে তারও মজা আছে।

সঞ্জু বিরক্ত গলায় বলল, মজা থাকলে তো ভালোই।

তোর কাছে কোন ঋতুটা ভালো লাগে ?

জানি না বাবা।

তোর ফেভারিট কোনো ঋতু নেই ? বর্ষা ? বর্ষা কেমন লাগে ? স্কুলে রচনা লিখিস নি—'আমার প্রিয় ঋতু' ?

বাবার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সঞ্জু হঠাৎ থমথমে গলায় বলল, বাবা রিকশা থামতে বলো।

ফরহাদ উদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

আমি অন্য রিকশায় যাব।

অন্য রিকশায় যাবি কেন ? এখনো চাপাচাপি হচ্ছে ? আচ্ছা আমি আরো সরে বসছি।

সরে বসতে হবে না। তুমি আরাম করে বোস। আমি অন্য রিকশায় যাব।

ফরহাদ উদ্দিন আহত গলায় বললেন, কেন ? বেশ তো দু'জনে গল্প করতে করতে যাচ্ছি।

সঞ্জু বিরক্ত গলায় বলল, আমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে বাবা।

ফরহাদ উদ্দিন ঢোঁক গিললেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুই সিগারট খাস না-কি ?

==========

সঞ্জু বাবার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রিকশাওয়ালাকে ধমক দিয়ে থামাল। হুট করে রিকশা থেকে নেমে গেল। বাবাকে বলল, বাবা তুমি তোমার মতো চলে যাও। আমি আসছি।

রিকশা চলতে শুরু করেছে। ফরহাদ উদ্দিন পেছনে ফিরে ছেলেকে দেখার চেষ্টা করছেন। তাকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাট ফাঁকা— এর মধ্যে সে কোথায় চলে গেল। শেষ পর্যন্ত যাবে তো ?

তাঁর ইচ্ছা করছে রিকশা থামিয়ে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে— এটা ঠিক হবে না। সে সিগারেট খাবে। এতে তাঁর অস্বস্তি, ছেলেরও অস্বস্তি। তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি আবার বন্ধ হয়ে আছে। গত এক সপ্তাহে তিনবার ঘড়ি বন্ধ হলো। নতুন একটা ঘড়ি কেনা দরকার। আজকাল ঘড়ি সস্তা হয়ে গেছে। দেড়শ দু'শ টাকায় ঘড়ি পাওয়া যায়। সমস্যা হলো ফরহাদ উদ্দিন পুরনো ঘড়ির মায়া ছাড়তে পারছেন না। এই ঘড়ির বয়স সঞ্জুর বয়সের কাছাকাছি। ইসলামপুর থেকে কিনেছিলেন তিনশ একুশ টাকা দিয়ে। ঘড়ি কেনার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল বদরুল পাশা। সে-ই পছন্দ করে ঘড়ি কিনেছে। ফেরার পথে বদরুল হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে নর্দমায় পড়ে গেল। তারপর আর উঠতে পারে না। ধরাধরি করে তোলা হলো। কত ঘটনা। বদরুল পাশা তার অতি প্রিয় বন্ধু ছিল। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। আবার কোনো একদিন কি ফিরে আসবে ? দুপুররাতে কলিং বেল টিপে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গম্ভীর গলায় বলবে— এই আমার মেয়ে কোথায় ?

তিনি বলবেন, তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?

আমি এতদিন কোথায় ছিলাম তা দিয়ে তোর দরকার কী ? আমার মেয়ে বের করে দে। প্যাচাল কথা এখন শুনব না।

রোদের তেজ কমে এসেছে। মনে হয় চারটা সাড়ে চারটা বাজে। তিনি যাচ্ছেন তাঁর প্রথম পক্ষের শ্বশুর বাড়িতে। সঞ্জুর নানার বাড়ি। সঞ্জুর মা'র মৃত্যুর পর এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শেষ হয়ে গেছে। সাত বছর পর এই প্রথম যাচ্ছেন। তাঁর শাশুড়ি খবর পাঠিয়েছেন— সঞ্জুকে নিয়ে তিনি যেন শুক্রবার বিকেলে অবশ্যই আসেন। জরুরি প্রয়োজন।

আজ কি বিশেষ কোনো দিন ? সঞ্জুর মা পারুলের জন্মদিন, মৃত্যুদিন কিংবা বিয়ের দিন। পারুল সম্পর্কে সবকিছুই ফরহাদ উদ্দিন ভুলে গেছেন। মাথার চুল সঞ্জুর মতো কোঁকড়া ছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। এটাও মনে থাকত না, মনে আছে কারণ কোঁকড়া চুল নিয়ে বিয়ের সময় খুব ঝামেলা হয়েছে। বিয়ে পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবার পর ফরহাদ সাহেবের বড় মামা (সালু মামা) হঠাৎ

==========

ঘোষণা করলেন— এই বিয়ে হবে না। মেয়ের মাথার চুল কোঁকড়ানো। কোঁকড়ানো চুলের মেয়ে অসতী হয়। লক্ষণ বিচার বইয়ে তিনি এই তথ্য পেয়েছেন। মেয়ের মাথার চুল শুধু যে কোঁকড়া তা-না। লালচে ভাবও আছে। অসতী নারীর চুল লালচে হয় এটিও না-কি শাস্ত্রে আছে। সালু মামা তাঁর ভাগ্নেকে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কিরে বদু (বদু ফরহাদ উদ্দিনের ডাক নাম) তুই জেনেশুনে অসতী নারী বিবাহ করবি ? ফরহাদ উদ্দিন ক্ষীণ গলায় অস্পষ্ট শব্দ করলেন যা খানিকটা 'না'-এর মতো শুনালো।

সালু মামা বললেন, লক্ষণ বিচার করে বিবাহ করতে হয়। বিয়ে তো তুই একবারই করবি। সেই বিয়েটা দেখে শুনে করা ভালো না ?

ফরহাদ উদ্দিন আবারো ক্ষীণ গলায় বললেন, হুঁ।

তাহলে ওদের 'নো' জানিয়ে দেই ?

আচ্ছা।

বদরুল পাশা তখন খুবই অবাক হয়ে বলল, মামা এটা কেমন কথা! কোঁকড়া চুল থাকলে মেয়ে অসতী হয়— এটা বই-এ পড়ে বিয়ে বাতিল করে দেবেন ? মেয়ের যে চুল কোঁকড়া এটা আগে দেখেন নি ?

সালু মামা বললেন, তুমি এর মধ্যে কথা বলছ কেন ? তুমি তো বিয়ে করছ না।

বদরুল পাশা বলল, আপনি তো মামা অন্যায় করতে পারেন না।

সালু মামা বললেন, পরিবারের স্বার্থে আমি অন্যায় করতে পারি। এখনই আমি কনে পক্ষকে 'নো' জানিয়ে দিচ্ছি।

ফরহাদ উদ্দিনের স্পষ্ট মনে আছে— নো জানিয়ে দেবার পর হুলুস্থুল পড়ে গেল। মেয়ের বাড়িতে কান্নাকাটি। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবা আরো দশ হাজার টাকা বাড়তি দিয়ে পরিস্থিতি সামলালেন। নির্বিঘ্নে বিয়ে সম্পন্ন হলো। বিয়ে বাড়ির খাওয়ার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। সালু মামা বললেন— তিনি তাঁর জীবনে এত ভালো খাসির কালিয়া খান নি। যে বাবুর্চি এই কালিয়া রান্না করেছে তার হাত রূপা দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়া দরকার। এই বলেই তিনি থেমে গেলেন না, বাবুর্চিকে পাশে দাঁড় করিয়ে হাসি হাসি মুখে ছবি তুললেন। বিয়ের আসরের ছবি তোলার জন্যে তিনি স্টুডিও থেকে ফটোগ্রাফার ভাড়া করে এনেছিলেন। খুবই দুঃখের কথা— দু'টা ছবি তোলার পরই ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেল। বিয়ের একমাত্র ছবি যে দু'টা তোলা হলো তা হচ্ছে বাবুর্চির কাঁধে হাত রেখে সালু মামার হাসি হাসি মুখের ছবি।

==========

বাসর ঘরে পারুলকে দেখে ফরহাদ উদ্দিন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে খাটের মাঝখানে রাজকন্যা বসে আছে। মানুষ এত সুন্দর হয়! পারুল নিঃশব্দে কাঁদছিল। নিতান্তই অপরিচিত, রূপবতী এক তরুণীর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে আর তিনি বসে আছেন বোকার মতো। মেয়েটাকে কী বলবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না। 'কেঁদো না' বলবেন, না-কি 'কাঁদছ কেন' ? কী জিজ্ঞেস করবেন তা ঠিক করতে তার চল্লিশ মিনিটের মতো লাগল। তিনি গলা খাকারি দিয়ে বললেন, কেঁদো না। বলেই খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন।

নববধূর কান্না তাতে থামল না, তবে কান্নার সঙ্গে শরীর দুলিয়ে হেঁচকি তোলা বন্ধ হয়ে গেল। বাসর ঘরে নববধূর সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলার নিয়ম— প্রেম ভালোবাসার কথা, ভাবের কথা, সুখ-দুঃখের কথা। তাঁর কোনো কথাই মনে পড়ল না। চুপচাপ বসে থেকে ক্লান্ত হতে হতে এক সময় বললেন, তোমাদের বাবুর্চির রান্না মাশাল্লাহ ভালো।

এই কথা শুনে পারুল চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে সামান্য বিস্ময়। তিনি তখন বললেন, বাবুর্চির নাম কী ?

পারুল ক্ষীণ গলায় বলল, ফজলু মিয়া।

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, ফজলু মিয়ার দেশের বাড়ি কোথায় ?

পারুল এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে রইল। তবে তার কান্না পুরোপুরি থেমে গেল। গাল চোখের পানিতে ভেজা ছিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে সে গাল মুছল। তার চোখের বিস্ময় আরো প্রবল হলো।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, এক গ্লাস পানি খাব। বলেই দেখলেন খাটের সঙ্গে লাগানো টেবিলে পানির জগ, গ্লাস সাজানো। তিনি নিজেই উঠে পরপর দু'গ্লাস পানি খেয়ে খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ছোট বাথরুম পায়। এখনো পাবে বলাই বাহুল্য। গ্রাম দেশের বাড়ি— এটাচড বাথরুম থাকবে না। বাসর ঘর থেকে বের হয়ে দূরের কোনো বাথরুমে যেতে হবে। নতুন জামাই বাসর ঘর থেকে বের হলে চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে। শালা শালীরা শুরু করবে নানান যন্ত্রণা। নতুন জামাইকে যন্ত্রণা দেয়া বিরাট আমোদের ব্যাপার। তিনি নিশ্চিত যে বাথরুমে ঢোকামাত্র তারা বাইরে থেকে বাথরুমের দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে। গ্রাম দেশে এই রসিকতা খুবই কমন রসিকতা। তাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত বাথরুমে বসে থাকতে হবে। শালা-শালীদের হাসি এবং ঠাট্টা-তামাশা শুনতে হবে। দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে তিনি আরো আধাগ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্রাবের বেগ হলো। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, বাথরুমে যাব।

==========

বাসর ঘর নিয়ে মানুষের কত সুখ-স্মৃতি থাকে। তাঁর সবই দুঃখময় স্মৃতি। বাথরুমে ঢোকার পর তারা সত্যি সত্যিই বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দিল। শালীর দল আজেবাজে কথা বলে হাসাহাসি করতে লাগল। 'দুলাভাই হাগে', 'দুলাভাই হাগে' বলে চিকন গলায় বিকট চিৎকার। এদের সঙ্গে বয়স্কদের হাসিও যুক্ত হলো। বয়স্করা মাঝে মাঝে প্রশ্রয় সূচক ধমক দিচ্ছেন— কী কর, ছেড়ে দাও না। আর কত!

কে কার কথা শুনে। তিনি দুই ঘণ্টার মতো সময় বাথরুমে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত বাথরুম থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনে পারুল। নতুন বউ এই কাজটা করেছে বলে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে— বেহায়া মেয়ে, বেলাজ মেয়ে।

বাসর রাতে পারুল তাকে বাথরুম থেকে নিজে শিকল খুলে বের করে আনছে— এই দৃশ্য অনেকদিন পরে মনে করে তাঁর কান্না পেয়ে গেল। তিনি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভালো মেয়ে ছিল। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দুই বছর এগারো মাস সুখে কেটেছে। তবে মেয়েটাকে বুঝতে বুঝতেই সময় কেটে গেল। চৈত্র মাসের এক দুপুরবেলা সব শেষ। তখন তিনি অফিস ক্যান্টিনে বসে হাফ বিরিয়ানির অর্ডার দিয়েছেন। বিরিয়ানি এরা ভালো বানায়। হাফ প্লেট বিরিয়ানির একটা কাবাব থাকে, অর্ধেকটা ভুনা ডিম থাকে। আলাদা করে প্লেটে তেঁতুলের ঝাল টক দেয়। হাফ প্লেটে পেট ভরে না, ক্ষিধে লেগে থাকে। ফুল প্লেটে আবার বেশি হয়ে যায়। তিনি ঠিক করে রেখেছেন হাফ প্লেটের পর অবস্থা বুঝে আরো হাফ প্লেটের অর্ডার দেবেন। সেদিন ক্ষিধেটা খুব মারাত্মক লেগেছিল। তিনি যখন খেতে বসেছেন তখন হন্তদন্ত হয়ে বদরুল পাশা উপস্থিত। সে মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এসেছে কিন্তু দিতে পারছে না। খাওয়ার সময় দুঃসংবাদ দিতে নেই। তিনি আরাম করে হাফ প্লেট বিরিয়ানি খাবার পর আরেক হাফ প্লেটের অর্ডার দিলেন। বন্ধুকে খাওয়াবার জন্যে পিড়াপিড়ি করলেন। তিনি বুঝতেই পারেন নি কত ভয়ঙ্কর ঘটনা বাসায় ঘটে গেছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ দিনের বিরিয়ানির স্বাদটা এখনো তাঁর মুখে লেগে আছে।

আজ আরেক চৈত্র মাস। তাহলে কি আজ পারুলের মৃত্যুদিবস ? সেই উপলক্ষে কোনো আয়োজন ? বাদ আছর মিলাদ হবে ? ফরহাদ উদ্দিন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন— স্ত্রীর মৃত্যুর তারিখ তাঁর মনে নেই। এটা লজ্জারই কথা। সঞ্জুর জন্মের তারিখ মনে আছে। সেখান থেকে হিসাব নিকাশ করে পারুলের মৃত্যুর তারিখ বের করা যাবে। একে বলে ব্যাক ক্যালকুলেশন। চট করে করা যাবে না, কাগজ কলম লাগবে।

জ্যামে রিকশা গাড়ি সব আটকা পড়ে আছে। কখন জ্যাম ছুটবে কে জানে।

চুপচাপ রিকশায় বসে থাকার চেয়ে মনে মনে অংকটা করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সঞ্জুর একবছর আঠারো দিন বয়সে তার মা মারা গেল। মূল ব্যাপার হলো আঠারো দিন। এই আঠারো দিন হয় যোগ করতে হবে কিংবা বাদ দিতে হবে। অংকের সুবিধার জন্য আঠারো দিনটা ধরা যাক পনেরো দিন। তিন হাতে থাকুক। পরে এই তিন হয়তোবা যোগ করতে হবে, কিংবা বিয়োগ করতে হবে। ফরহাদ সাহেবের মাথা অল্প সময়ের মধ্যেই জট পাকিয়ে গেল। তিনি হতাশ চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তখনই সঞ্জুকে দেখলেন। সঞ্জুর রিকশাটা ঠিক তাঁর রিকশার বাম পাশে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছা করলেই তিনি সঞ্জুর রিকশায় উঠে যেতে পারেন। সঞ্জু গম্ভীর চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফরহাদ উদ্দিন খুশি খুশি গলায় বললেন, এই সঞ্জু!

সঞ্জু তাকাল। বিরক্তিতে তার ভুরু কুঁচকে গেল।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তোর জন্ম তারিখ কবে?

মে মাসের ন' তারিখ।

ন' তারিখ থেকে পনেরো বাদ দিলে কত হয়?

কী বলছ কিছু বুঝতে পারছি না।

ফরহাদ উদ্দিন হঠাৎ খুশি খুশি গলায় বললেন, এক কাজ কর— আমার রিকশায় চলে আয়।

কেন?

গল্প করতে করতে যাই। তোর সিগারেট খাওয়া তো হয়ে গেছে, না-কি আরেকটা খাবি?

সঞ্জু আবারো গম্ভীর হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেমেয়ে সব সময় বাবা-মা'র মতো হয় এটাই নিয়ম। সঞ্জু কার মতো হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। তার মা'র মতো নিশ্চয়ই হয় নি। পারুল গম্ভীর ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো গম্ভীর ছিল। তিনি ভুলে গেছেন। পারুলের বিষয়ে তাঁর তেমন কোনো স্মৃতি নেই। কিছু কিছু স্মৃতি আবার খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে।

যেমন পারুল সম্পর্কে তাঁর খুব স্পষ্ট একটা স্মৃতি হচ্ছে বিয়ের পর পর সে যখন ঢাকায় থাকতে এলো তখনকার ঘটনা। সকালবেলা নাশতা খেতে গিয়ে গলায় রুটি আটকে গেল। হাত-পা এলিয়ে চেয়ারে পড়ে গেল, সেখান থেকে মেঝেতে। বাড়িতে তখন তিনি আর একটা কাজের মেয়ে। বেবীট্যাক্সি এনে অতিদ্রুত পারুলকে কোনো হাসপাতালে নিতে হবে। তিনি ছুটে ঘর থেকে বের হতে গেলেন— দরজার কোণায় ধাক্কা লেগে তিনি নিজেই মেঝেতে উল্টে পড়ে

==========

অচেতন। যখন জ্ঞান হলো তিনি দেখেন তাঁকে খাটে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর মাথায় পানি ঢালছে পারুল নিজেই। জ্ঞান হারাবার আগ পর্যন্ত এবং জ্ঞান ফিরে পাবার পরের প্রতিটি ঘটনা তাঁর মনে আছে। পারুল যে মুখ টিপে হাসতে হাসতে তাঁর মাথায় পানি ঢালছে এটা তাঁর মনে আছে। পারুলের গলায় সবুজ পাথর বসানো একটা রূপার মালা দুলছিল সেটি পর্যন্ত মনে আছে। এই ঘটনাটা নিয়ে তিনি কখনো কারো সঙ্গে আলাপ করেন নি।

পারুলের মৃত্যুর পর রাহেলাকে বিয়ে করলেন। রাহেলার সঙ্গে প্রথম স্ত্রীর কোনো গল্প করার প্রশ্নই উঠে না। নাশতার টেবিলে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে পারুলের গলায় রুটি আটকে যাবার ঘটনাটা মনে পড়ে। ব্যস এই পর্যন্তই। গত মাসের প্রথম দিকে শুক্রবারে তিনি নাশতা খেতে বসেছেন। ডিমভাজা, রুটি আর সুজির হালুয়া। রাহেলা বসেছে তাঁর বাঁদিকের চেয়ারটায়। রাহেলা বলল, আজকের রুটিটা যে অন্যরকম বুঝতে পারছ ?

তিনি বললেন, না।

রাহেলা বলল, তোমাকে নতুন কিছু করে খাওয়ানো অর্থহীন। কিছুই বুঝতে পার না। আজকের রুটি তো আটার রুটি না। আলুর রুটি। আলু সিদ্ধ করে কাই বানিয়ে বেলে রুটি বানানো হয়েছে।

তিনি বললেন, ও।

রাহেলা তখন হঠাৎ তাঁকে চমকে দিয়ে বলল, রুটি গলায় আটকে আমি যে একবার মরতে বসেছিলাম তোমার মনে আছে ?

ফরহাদ উদ্দিন হতভম্ব হয়ে গেলেন। রাহেলা কী বলছে ? সে আবার কখন গলায় রুটি আটকে মরতে বসল !

এইভাবে তাকাচ্ছ কেন ? সমস্যাটা কী ?

কোনো সমস্যা না।

তোমার ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয় কোনো সমস্যা যাচ্ছে। অফিসে কিছু হয় নি তো ?

না।

রুটি গলায় আটকে যাবার কথা শুনে এমন চমকে গেলে কেন বলো তো ?

চমকাই নি তো!

রাহেলা বলল, কতদিন আগের ঘটনা অথচ মনে হয় এই তো গত সপ্তাহে। তুমি ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেয়ে ধরাম করে পড়ে গেলে। তোমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়েই মনে হয় আমার গলা দিয়ে রুটি নেমে গেল।

==========

তোমাকে নিয়ে তখন দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি। মাথায় পানি ঢালাঢালি।... এরকম করে তাকাচ্ছ কেন ? মনে নেই ?

ফরহাদ উদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, মনে আছে।

আলু-রুটি খেতে কেমন হয়েছে ?

ভালো হয়েছে।

ভালো হয়েছে তাহলে মুখে রুটি নিয়ে বসে আছ কেন ? খেতে ভালো না লাগলে বলো— নরম্যাল রুটি সেঁকে দেব।

আচ্ছা।

আলু-রুটি তোমার বড় মেয়ে বানিয়েছে। কোন বই-এ যেন রেসিপি পড়েছে। এই মেয়েটার রান্না-বান্নার দিকে ঝোঁক আছে। প্রায়ই এটা সেটা রাঁধে। ঐদিন করল চিনাবাদামের ভর্তা। চিনাবাদাম পিষে, সরিষার তেল, কাঁচামরিচ, আদা দিয়ে মেখে সামান্য তেলে ভেজে করেছে। খেতে অসাধারণ হয়েছে। তোমাকেও তো অফিসে পাঠিয়েছিলাম।

ফরহাদ সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, খেতে ভালো হয়েছিল। খুবই সুস্বাদু হয়েছিল।

রাহেলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কী উল্টাপাল্টা কথা বলছ ? খেতে ভালো হয়েছে তুমি বুঝলে কীভাবে ? তুমি তো মুখেও দাও নি। ভর্তা যেমন পাঠিয়েছিলাম সে-রকম ফেরত এসেছে। তোমার সমস্যাটা কি বলবে ? তুমি কি আমাদের কোনো কথাই মন দিয়ে শোন না ? সারাক্ষণ কপাল কুঁচকে কী চিন্তা কর ?

ফরহাদ উদ্দিন জবাব দেন নি। খুব মন দিয়ে আলুর রুটি খেতে শুরু করেছিলেন। বড় রকমের কোনো ধাক্কা খেলে যে-কোনো একটা কাজ খুব মন দিয়ে করা শুরু করতে হয়। এতে ধাক্কাটা কম লাগে। স্মৃতি সংক্রান্ত জটিলতায় সেদিন তিনি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিলেন। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তাঁর সবস্মৃতিই এলোমেলো হয়ে গেছে ? সবুজ পাথর বসানো রূপার যে হারটা দুলতে দেখেছিলেন সেই হারটাও কি রাহেলার ? রাহেলার গলায় এই হার তো কখনো দেখেন নি। রূপার গয়না রাহেলার পছন্দ না। সে বলে— রূপা পরবে ছেলেরা, তাদের হাতে থাকবে রূপার আংটি। সোনা পরবে মেয়েরা। এই কথাগুলি রাহেলার তো ? না-কি পরে দেখা যাবে কথাগুলি আসলে বলেছিল পারুল।

খুবই জটিল সমস্যা। কারো সঙ্গে সমস্যাটা নিয়ে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। কার সঙ্গে আলাপ করবেন ? সবচে' ভালো হতো নিজের ছেলের

==========

সাথে আলাপ করলে। ছেলের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা হচ্ছে ঘরের কথা ঘরে থাকবে। বাইরে বের হবে না। সঞ্জু খুবই চুপচাপ ধরনের ছেলে। তাকে দেখে মনে হয় সে সারাক্ষণই কিছু ভাবে। বড় হলে হয়তো কবি টবি হবে। তাঁর আত্মীয়স্বজনের বিরাট গুষ্ঠির মধ্যে কোনো কবি সাহিত্যিক নেই। একজন থাকলে ভালোই হয়।

জ্যাম কেটেছে। রিকশা চলতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফস করে নিভে গেছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। বৎসরের প্রথম বৃষ্টি। ভিজতে পারলে ভালো হতো। গায়ের ঘামাচি মরে যেত। বৎসরের প্রথম বৃষ্টিতে থাকে ঘামাচির ওষুধ। বৎসরের শেষ বৃষ্টিতে থাকে চোখ ওঠা রোগের ওষুধ।

আল্লাহপাক মানব জাতির জন্যে রোগ যেমন দিয়েছেন, রোগের ওষুধও দিয়েছেন। গাছপালায় ওষুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। বৃষ্টিতে ওষুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আকাশের মেঘ কনট্রোল করার জন্যে তিনি আলাদা একজন ফেরেশতা রেখেছেন। ফেরেশতার নাম মীকাইল। হযরত মীকাইল আলায়হেস সালাম। তাঁর দায়িত্ব হলো— মেঘ পরিচালনা করা আর মানুষের রুটি-রুজি বণ্টন করা।

টপ করে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি ফরহাদ উদ্দিনের মাথায় পড়ল। তিনি চমকে আকাশের দিকে তাকালেন। বৎসরের প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা যার উপর পড়ে তার উপর আল্লাহপাকের অসীম রহমত। তার একটি ইচ্ছা তৎক্ষণাত পূরণ করা হয়। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা যে তাঁর উপরই পড়েছে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই— তবে পড়তেও তো পারে। যদি পড়ে থাকে তাহলে তাঁর একটি ইচ্ছা পূরণ হবে। দ্রুত কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। কী চাওয়া যায় ? কিছুই মাথায় আসছে না। ফরহাদ উদ্দিন অস্থির বোধ করছেন। নিঃশ্বাসেও খানিকটা কষ্ট হচ্ছে। কানের কাছে গরম লাগছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। খারাপ কিছু ঘটছে না তো। হার্ট এটাক ? হার্ট এটাকের সময় বুকে ব্যথা হয়। তাঁর বুকে অবশ্যি ব্যথা হচ্ছে না। তবে তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে এক্ষুণি ব্যথা শুরু হবে। তিনি দু'হাতে রিকশার হুড ধরলেন। সঞ্জু পাশে থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না। সে শক্ত করে বাবাকে ধরে থাকত। আশেপাশের কোনো রিকশায় সঞ্জুকে দেখা যাচ্ছে না। খুব পানির পিপাসা হচ্ছে। রিকশাওয়ালাকে তিনি কি বলবেন রিকশা থামিয়ে তাঁর জন্যে পানির একটা বোতল নিয়ে আসতে ? ঠাণ্ডা এক বোতল পানি। খানিকটা খাবেন, খানিকটা গায়ে মুখে মাখবেন।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আরাম লাগছে। ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো হঠাৎ তাঁর শরীর ছেড়ে দিচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

==========

তিনি কি রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়বেন ? রিকশায় ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস তাঁর আছে। একবার অফিস থেকে বাড়িতে ফেরার পথে তিনি রিকশায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখেন রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে রিকশা দাঁড় করিয়ে চায়ের গ্লাসে পাউরুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে। তাঁকে জেগে উঠতে দেখে কাছে এসে বলল— স্যারের শইল খারাপ ? ঘুমাইয়া পড়ছিলেন এই জন্যে রিকশা খাড়া করাইছি। গরম এক কাপ চা খাইবেন ?

তিনি শুধু যে চা খেলেন তা না। তাঁর ক্ষিধে লেগেছিল, তিনি রিকশাওয়ালার মতো একটা পাউরুটি নিয়ে ঠিক তার মতোই চায়ে ডুবিয়ে আরাম করে খেলেন। চা-পাউরুটির দাম দিতে গেলেন— রিকশাওয়ালা তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, দাম দেওন লাগব না। রিকশাওয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কিছু বলা উচিত ছিল। তিনি কিছুই বলেন নি। বরং এমন ভাব করেছেন যে প্যাসেঞ্জারের চা-নাশতার পয়সা রিকশাওয়ালা দেবে এটাই স্বাভাবিক। রিকশাওয়ালার সঙ্গে ছয় টাকা ভাড়া ঠিক হয়েছিল, তিনি তাকে ঠিক ছয় টাকাই দিলেন। একটা টাকা বেশি দিলেন না। তবে মনে মনে ঠিক করে রাখলেন— কোনো একদিন তাকে বাসায় দাওয়াত করে খাওয়াবেন। ঢাকা শহর এমনই এক শহর যে ঘুরে ফিরে পরিচিত সবার সঙ্গেই কখনো না কখনো দেখা হবে। তখন দাওয়াতটা দিলেই হলো। রিকশাওয়ালার চেহারা তাঁর মনে আছে। বিখ্যাত এক ব্যক্তির চেহারার সঙ্গে তার চেহারার খুবই মিল আছে— আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। গালভাঙা মুখ, দাড়ি লম্বা। চোখ কোটরে ঢোকা। ঢাকা শহরে হরতালের দিন বোমাবাজিতে কিছু রিকশাওয়ালা মারা যায়। তাদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। ফরহাদ উদ্দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখেন। আব্রাহাম লিংকনের সঙ্গে তাদের চেহারার কোনো মিল আছে কি-না। যখন দেখেন কোনো মিল নেই তখন স্বস্তি বোধ করেন।

ঝুমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা। ঠাণ্ডায় ফরহাদ সাহেবের শরীর জমে যাচ্ছে— কিন্তু তার পরেও কানের কাছে গরম লাগছে। সেই সঙ্গে এমন ঘুম লাগছে যে চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না। যেভাবেই হোক কিছুক্ষণ জেগে থাকতেই হবে। পাঁচ ছয় মিনিট জেগে থাকতে পারলেই হবে। রিকশা গলির ভিতর ঢুকে পড়েছে। গলির মাঝামাঝি একটা নাপিতের দোকান— 'আশা হেয়ারকাটিং'। নাপিতের দোকানের সামনে থেকে বাঁ দিকে আরেকটা গলি বের হয়েছে। সেই গলির শেষ মাথায় দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা বড় কাঠগোলাপের গাছ আছে। বিশাল গাছ কিন্তু কোনো ফুল ফুটে না। বাড়ির একটা সুন্দর নাম আছে, নামটা মনে পড়ছে না। নামটা মনে

==========

পড়লে খুব লাভ হতো, রিকশাওয়ালাকে বাড়ির নাম বলে ঘুমিয়ে পড়তেন। ফরহাদ সাহেব বাড়ির নাম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফুলের নামে নাম। খুবই পরিচিত ফুল। নামের মধ্যেই জঙ্গল জঙ্গল ভাব আছে। নামটা মনে হলেই নাকে ফুলের গন্ধ লাগে এবং কেমন ছায়া ছায়া ভাব হয়। একটা গানেও নামটা আছে। গানটা মনে পড়লেই ফুলের নাম মনে পড়বে। সাত ভাই চম্পা জাগরে। বাড়ির নাম কি চম্পা হাউস ? না চম্পা হাউস না, ইংরেজি নাম না, বাংলা নাম। পুরো গানটা যেন কী—

সাত ভাই চম্পা জাগরে
কেন বোন পারুল ডাকরে।

বাড়ির নাম মনে পড়েছে— 'পারুল কুটির'। এই নামটা এতক্ষণ মনে পড়ল না। অথচ তার স্ত্রীর নামে নাম। পারুল কুটির নামে জঙ্গল জঙ্গল কোনো ভাব তো নেই। তাহলে কেন মনে হলো জঙ্গল জঙ্গল ভাব ? পারুলের ইংরেজি কী ? সব ফুলেরই ইংরেজি নাম আছে। গোলাপ— রোজ, যুই— জেসমিন, পারুলের কি কোনো ইংরেজি নেই ? পারুলের ইংরেজি কী ভাবতে ভাবতে ফরহাদ উদ্দিন রিকশার ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বজ্রপাত হলো। তার চেয়েও বিকট শব্দে ফাটল ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ট্রান্সফরমার। এতেও তাঁর ঘুম ভাঙ্গল না।

ফরহাদ উদ্দিনের ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যায়। চোখ মেলেই তিনি খুব আরাম পেলেন। নরম ফোমের বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন। গায়ে ধোয়া চাদর। ধোয়া চাদর থেকে আরামদায়ক গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কেউ একজন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার আঙুলগুলি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে সে হাত বুলাবার আগে তার আঙুল ডীপ ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেখে ঠাণ্ডা করে আনছে। কনক না-কি ? কনকের হাতের আংগুল এরকম ঠাণ্ডা। সে এ বাড়িতে আসবে কীভাবে। না-কি কেউ তাকে খবর দিয়ে এনেছে। ফরহাদ উদ্দিন পাশ ফিরলেন। আর তখনই কে একজন বলল, এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

তিনি ভালোমতো চোখ মেললেন। অপরিচিত একজন মহিলা বিছানার ডান পাশে রাখা চেয়ারে বসে আছেন। একজন চেনা মানুষের দেখা পেলে হতো। ভদ্রমহিলা একটু কাছে ঝুঁকে এসে নরম গলায় বললেন, উঠার দরকার নেই। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

ফরহাদ উদ্দিন লজ্জিত গলায় বললেন, জ্বি লাগছে।

==========

আমরা তো খুবই ভয় পেয়েছিলাম। ডাক্তার এসে দেখে গেছে। ডাক্তার বলেছে সব ঠিক আছে। ব্লাড প্রেসার সামান্য কম, অতিরিক্ত দুর্বলতা থেকে এরকম হয়েছে। আরাম করে কিছুক্ষণ ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি এখন ঠিক আছি।

এরকম কি আগেও হয়েছে ?

জ্বি না। সঞ্জু কোথায় ?

দুধ নিয়ে আসি, এক গ্লাস দুধ এনে দেই ?

জ্বি আচ্ছা।

ভদ্র মহিলা দুধ আনতে গেলেন। ফরহাদ উদ্দিন মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন এতক্ষণ কে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আশ্চর্য, কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা মনে হয় স্বপ্নে ঘটেছে। স্বপ্নটা আরো কিছুক্ষণ থাকলে ভালো হতো।

একটা গ্লাস ভর্তি দুধ নিয়ে ভদ্রমহিলা আবার ঢুকলেন। তাকে আগে যতটা অচেনা লাগছিল এখন তারচেয়েও অচেনা লাগছে। এমন কি হতে পারে যে তিনি ভুল কোনো বাড়িতে ঢুকেছেন ? তিনিও এদের চেনেন না, এরাও তাঁকে চেনে না। রিকশা হয়তো অন্য একটা বাড়ির সামনে থেমেছে। বাড়ির লোকজন দয়া করে তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়েছে। সঞ্জু সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। সঞ্জুকে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। সে হয়তো শেষ পর্যন্ত আসে নি।

দুধটা খান।

একটু পরে খাই।

ঠিক আছে একটু পরেই খান। আরো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন।

ভদ্রমহিলা আবারো আগের চেয়ারটায় বসলেন। এবার তাঁকে একটু যেন চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে একটা মানুষকে কিছুক্ষণ চেনা লাগছে আবার কিছুক্ষণ অচেনা লাগছে। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন ? ফরহাদ উদ্দিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

মিথ্যা সূচক হ্যাঁ মাথা নাড়া ঠিক হয় নি। মুখে মিথ্যা বলাও যা— মিথ্যা মাথা নাড়াও তা। না বলা উচিত ছিল। সেটা অবশ্যি ঠিক হতো না। আত্মীয়স্বজনকে চিনতে না পারা খুবই লজ্জার ব্যাপার। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেই পরিচয় বের হয়ে আসবে। ভদ্রমহিলা বললেন, অনেকদিন পরে দেখা তো এই জন্যে ভাবলাম চিনতে পারেন নি।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আপনি ভালো আছেন ?

==========

আমাকে আপনি করে বলছেন কেন ?

ও আচ্ছা ঠিকই তো। আপনি করে কেন বলছি। বয়স হয়েছে তো—উল্টাপাল্টা কাজ করি। আপনি তুমি-তে জট পাকিয়ে ফেলি। তুমি ভালো আছ ?

জ্বি ভালো।

ছেলেমেয়েরা ভালো ?

প্রশ্নটা করেই ফরহাদ সাহেব শঙ্কিত বোধ করলেন। এটা একটা ভুল প্রশ্ন হয়েছে। হয়তো এই মহিলার ছেলেমেয়ে হয় নি। এরকম দম্পতি আছে যাদের কোনো ছেলেমেয়ে হয় না। তাদের অফিসের বড় সাহেব কর্নেল হাবীবুর রহমান সাহেবেরই কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও স্ত্রীকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড ঘুরে এলেন। যাদের বাচ্চা কাচ্চা হয় না তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় ছেলেমেয়েরা কেমন আছে তারা খুবই মনে কষ্ট পায়।

ভদ্রমহিলা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে। দুলাভাই, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

ফরহাদ উদ্দিন হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন। মহিলা হাসিমুখে বললেন—পারুল আপার মেজো ভাই ইস্তিয়াক। আমি তার স্ত্রী। আপনি এখন আবার বলে বসবেন না যে ইস্তিয়াককে চেনেন না।

কী যে তুমি বলো! কেন চিনব না।

ও কী করে বলুন তো ?

ব্যবসা করে।

না, পুলিশ অফিসার। ডিবিতে আছে। এসপি। প্রমোশন হবার কথাবার্তা হচ্ছে। প্রমোশন হলেই ডিআইজি হবে।

বাহ্ ভালো তো।

আপনার সঙ্গে এখন আর এই পরিবারের কোনো যোগাযোগ নেই—আপনিও কিছু জানেন না। আমরাও আপনার ব্যাপারে কিছু জানি না।

ইস্তিয়াক কোথায় ?

ও খুব জরুরি কাজে অফিসে আটকা পড়েছে। আপনি যে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন এই খবর সে জানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

শাশুড়ি আম্মা, উনি কোথায় ?

উনি তো এ বাড়িতে থাকেন না। ইস্তিয়াকের ছোট ভাই মনোয়ারের বাসায়

==========

থাকেন। মনোয়ার থাকে ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে। আপনি তো জানেন সে ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির টিচার।

ফরহাদ উদ্দিন কিছুই জানেন না তারপরেও বললেন, জানি। কিছু কিছু খবর রাখার চেষ্টা করি। কাজে কর্মে এত ব্যস্ত থাকি যোগাযোগটা রাখা সম্ভব হয় না। শাশুড়ি আম্মা চিঠি লিখেছিলেন এ বাড়িতে আসার জন্যে, তাই ভেবেছি উনি এ বাড়িতেই আছেন।

উনি আপনাকে কোনো চিঠি লিখেন নি। আমিই চিঠি লিখে আপনাকে আনিয়েছি। উনার হয়ে চিঠি লিখেছি যাতে আপনি আসেন।

ও।

মা'র শরীর খুবই খারাপ। প্যারালাইসিস হয়েছে। বিছানায় শুয়ে থাকেন। কাউকে চিনতে পারেন না। কানে খুব ভালো শোনেন। কোনো মেয়ের গলা শুনলেই মনে করেন পারুল আপা এসেছেন। তার বড় মেয়ে যে মারা গেছে এই বোধ নেই।

কত দিন ধরে এই অবস্থা ?

অনেক দিন, তবে মাঝে মাঝে সুস্থ থাকেন তখন সবাইকে চিনতে পারেন। সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন।

ও।

দুধটা খান।

আমি দুধ খাই না, ভালো লাগে না।

চা বানিয়ে আনব চা খাবেন ?

আচ্ছা আন চা, এক কাপ খাই।

আমার নাম কি আপনার মনে আছে ?

ফরহাদ উদ্দিন কিছুক্ষণ হতাশ চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার নাম আমার মনে নাই।

এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় না, নাম মনে না থাকাটা তো অস্বাভাবিক কিছু না।

ফরহাদ উদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর থেকে স্মৃতি শক্তি কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। শরীরটাও খারাপ।

শরীর যে খারাপ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন ভালো লাগছে না ?

হুঁ এখন ভালো লাগছে।

==========

গরম চা খেয়ে শুয়ে থাকুন। ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনাকে আর ডিসটার্ব করব না। ইস্তিয়াক আসার পর ডেকে তুলব।

আচ্ছা।

আমার নাম তো আপনি আর জিজ্ঞেস করলেন না।

তোমার নাম কী ?

দুলি। দুলালী থেকে দুলি।

এখন মনে পড়েছে।

দুলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বিশ বছর কোনো মিথ্যা কথা বলবেন না। বিশ বছর মিথ্যা কথা না বললে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হয়। ঐ প্রতিজ্ঞা কি এখনো আছে ? আপনার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হয়েছে ?

ফরহাদ উদ্দিন লজ্জিত মুখে হাসলেন।

দুলি বলল, প্রশ্নের জবাব তো দিলেন না।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, এই বৎসর ডিসেম্বরের দিকে কুড়ি বছর হবে।

এতদিন কোনো মিথ্যা বলেন নি ?

টুকটাক বলেছি। যেমন তুমি যখন জিজ্ঞেস করলে তোমার নাম মনে আছে কিনা। তখন আমার নাম মনে ছিল না, তারপরেও চিনেছি এই ভাব করে মাথা নাড়লাম।

আপনার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা হয়েছে ?

এখনো তো কুড়ি বছর হয় নি।

দুলি আগ্রহের সঙ্গে বলল, কুড়ি বছর পর সত্যি যদি আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষমতা হয় আমাকে বলবেন। আমিও মিথ্যা বলা ছেড়ে দেব।

তুমি কি মিথ্যা বলো ?

আমি বেশির ভাগ কথাই মিথ্যা বলি। প্রয়োজনে তো বলিই, অপ্রয়োজনেও বলি।

দুলি বলল, আপনি অসুস্থ মানুষ তারপরেও আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। দুলাভাই কিছু মনে করবেন না।

না কিছু মনে করি নি।

আপনি তো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা মানুষ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। আপনি হয়তো জানেন না, এ বাড়ির সবাই আপনাকে খুব পছন্দ

==========

করে। প্রায়ই আপনার কথা হয়। আমার শাশুড়ি যখন সুস্থ থাকেন তখন তিনি বলেন— 'বাজার থেকে বাইম মাছ কিনে আন। বাইম মাছের ঝোল রান্না করে পারুলের জামাইকে খেতে বলো।' বাইম মাছ নাকি আপনার খুব পছন্দ।

হ্যাঁ আমার খুব পছন্দ। এখন অবশ্যি খাওয়া হয় না— বাসায় কেউ বাইম মাছ পছন্দ করে না। দেখতে সাপের মতো তো এই জন্যে।

আমি নিজেও বাইম মাছ খাই না, তবে আপনাকে একদিন রান্না করে খাওয়াব।

আচ্ছা।

আমি আপনার চা নিয়ে আসছি। চায়ে তো চিনি দেব না তাই না?

এক চামচ চিনি দিও। বিনা চিনির চা খেতে পারি না।

দুলি চা আনতে গেল। ফরহাদ উদ্দিন উঠে বসলেন। শরীরের ক্লান্ত ভাবটা পুরোপুরি চলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে ভালো লাগবে। ছাতায় বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগে। অনেক দিন ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে হাঁটা হয় না।

দুলি চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল। চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ইস্তিয়াক টেলিফোন করেছে ও রাত বারোটার আগে ফিরতে পারবে না। তবে আপনার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছে। গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

দরকার নেই। ছাতা থাকলে দাও। ছাতা নিয়ে চলে যাব।

অসম্ভব! আপনাকে গাড়ি ছাড়া পাঠাব না। ইস্তিয়াক বলেছে কাল সন্ধ্যার পর আপনাকে আসতে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। গাড়ি পাঠাবে।

গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। আমি চলে আসব।

আপনি সঙ্গে করে সঞ্জুকে আনবেন।

ও কোথাও যেতে চায় না।

নিজের মামার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না! আপনি বলে টলে তাকে নিয়ে আসবেন।

আচ্ছা।

ও এবার এমএ পরীক্ষা দিয়েছে না?

হুঁ। ভাইভা বাকি আছে।

দুলি খানিকটা ইতস্তত করে বলল, তার মামা বোধহয় সঞ্জুর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

==========

সঞ্জুর কোন ব্যাপারে ?

আমি ঠিক জানি না। তবে ব্যাপারটা জরুরি।

আমি তাকে নিয়ে আসব।

দুলাভাই আপনি কি একা একা যেতে পারবেন, না আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

আমি একাই যেতে পারব।

কাল রাতে আমাদের এখানে খাবেন। আমি আপনার জন্য বাইম মাছ রান্না করে রাখব।

আচ্ছা।

বাইম মাছ ছাড়া আপনার আর কী পছন্দ ?

কাঁঠালের বিচি দিয়ে শুঁটকি মাছ। আমার মেয়েরা শুঁটকি মাছ খায় কিন্তু কাঁঠালের বিচি দিয়ে খায় না।

আমি কাঁঠালের বিচি দিয়ে শুঁটকি মাছ রান্না করে রাখব। আপনি কিন্তু কাল অবশ্যই সঞ্জুকে নিয়ে আসবেন।

আসতে না চাইলে জোর করে তো আনতে পারব না। ছেলে বড় হয়েছে, নিজের মতামত হয়েছে।

আসতে না চাইলে বলবেন হাসনাতের ব্যাপারে সঞ্জুর সঙ্গে তার মামা কথা বলবেন।

হাসনাত কে ?

আপনি চিনবেন না। সঞ্জু চিনবে। হাসনাতের কথা বললেই সঞ্জু চিনবে।

আচ্ছা আমি হাসনাত সাহেবের কথা বলব। দুলি তুমি আমাকে একটা ছাতা জোগাড় করে দাও— ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যেতে ইচ্ছা করছে। গাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে না।

দেখি ঘরে ছাতা আছে কি-না। মেয়েদের রঙচঙা একটা ছাতা আছে, ঐ টা নিবেন ?

আমার কোনো অসুবিধা নেই।

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। মেয়েদের একটা ছাতা নিয়ে ফরহাদ উদ্দিন এগোচ্ছেন। তাঁর খুবই ভালো লাগছে। রাস্তায় পানি জমে আছে। ফুটপাত পর্যন্ত এখনো পানি উঠে নি। তিনি ফুটপাত দিয়ে না হেঁটে রাস্তার নোংরা পানিতে পা ফেলে ছপ ছপ শব্দ করতে করতে এগুচ্ছেন। হলুদ স্ট্রিট ল্যাম্প জ্বলছে। হলুদ আলো

==========

পানিতে নানা রকম নকশা তৈরি করছে। দেখতে এত ভালো লাগছে। ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো আরেকটু পানি হয়ে পুরো রাস্তাটা ডুবে গেলে ভালো হতো। রাস্তাটাকে মনে হতো নদী। একটা মানুষ নদীর ওপর হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কী মজার ব্যাপার।

==========

সঞ্জুর ঘর থেকে ছুরতা দিয়ে সুপারি কাটার মতো কুট কুট শব্দ হচ্ছে। ফরহাদ উদ্দিন অবাক হয়ে শব্দটা শুনছেন। কুট কুট কুটুর কুটুর। এর মানে কী ? সঞ্জু সুপারি কাটবে কেন ? মজার ব্যাপার তো !

রাত এগারোটা বাজে। ঘণ্টা দু'একের জন্যে বৃষ্টি থেমেছিল, এখন আবার শুরু হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। আজ রাতের ঘুমটা আরামের হবে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে শুতে হবে। মাথার কাছের জানালাটা খোলা থাকবে। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আসবে— আসুক। একটু আধটু বৃষ্টির ফোঁটা মাথায় লাগলে কিছু হবে না। গত কয়েক রাত খুব গরম গেছে। আজ রাতটা আরামে যাবে। ঘুমুতে যাবার আগে ফরহাদ উদ্দিন ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার জন্যে এসেছেন। টুকটাক কিছু কথা বলবেন। হালকা গলায় জিজ্ঞেস করবেন— 'তোর মামার বাসায় শেষ পর্যন্ত তুই গেলি না, সবাই অপেক্ষা করে ছিল।' অভিযোগ না, এম্নি কথার কথা। ঘুমুতে যাবার আগে কঠিন কথা বলা একেবারেই ঠিক না। এতে ঘুমের অসুবিধা হয়। বদহজম হয়। বদহজম মানেই দুঃস্বপ্ন দেখা।

কঠিন কথা বলতে হয় দিনে। সন্ধ্যার পর থেকে হালকা কথাবার্তা। টিভিতে নাটক ফাটক দেখা। ছবিওয়ালা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টানো। পরিবারের লোকজন নিয়ে সামান্য হাসাহাসি।

ফরহাদ উদ্দিন সঞ্জুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে ঢুকবেন কি ঢুকবেন না মন স্থির করতে পারছেন না। কেন জানি ঘুম আসছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কনকের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। সে বাসায় নেই। রাহেলা তাকে নিয়ে কোথায় জানি বেড়াতে গেছে। কোথায় গেছে, কেন গেছে সবই তাঁকে বলা হয়েছে কিন্তু তিনি এখন মনে করতে পারছেন না। হয়তো শোনার সময় ঠিকমতো শুনেন নি।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলের ঘরের দরজায় হাত রেখে সামান্য চাপ দিলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ কি-না তার পরীক্ষা। তিনি ঠিক করে রেখেছেন ভেতর

==========

থেকে ছিটকিনি দেয়া থাকলে তিনি আর ঢুকবেন না। সকালবেলা সঞ্জুর সঙ্গে কথা বলবেন। অফিসে যাবার আগে ছেলের ঘরে উঁকি দিয়ে বলবেন— কাল রাতে তোর ঘরে কুটকুট শব্দ হচ্ছিল। ব্যাপার কী রে ? সুপারি কাটছিলি না-কি ? বিটল নাট কাটিং ?

সঞ্জুর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ না। চাপ পড়তেই দরজা ফাঁক হলো। ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় আলো এসে পড়ল। সঞ্জু গম্ভীর গলায় বলল, কে ? ফরহাদ উদ্দিন বললেন, কী করছিস ? সঞ্জু জবাব দিল না, তবে কুট কুট শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ফরহাদ উদ্দিন ঘরে ঢুকে পড়লেন।

সঞ্জু খাটে পা তুলে বসে আছে। তার হাতে চকলেটের টিন। কুট কুট শব্দ টিন থেকে আসছে। মনে হয় টিনটা বাঁকা হাতের চাপ লেগে শব্দ হচ্ছে। সঞ্জুর ঘর খুব গোছানো। এই বয়সের ছেলের ঘর গোছানো থাকে না। জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো থাকে। সঞ্জু তাদের মতো না। সুন্দর করে সাজানো ঘর দেখতে ভালো লাগে। ফরহাদ উদ্দিন আনন্দ নিয়ে চারদিকে তাকালেন। সঞ্জুর পড়ার টেবিলের সামনের দেয়ালে আইনস্টাইনের বড় একটা পোস্টার। মাথা ভর্তি ধবধবে সাদা চুল নিয়ে বিজ্ঞানী বসে আছেন। আউলা ঝাউলা চোখ।

আইনস্টাইনের ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন ফরহাদ উদ্দিন। হাসি মুখে বললেন— তোর খবর কী ?

ভালো।

সুপারি কাটার মতো কুট কুট শব্দ হচ্ছিল। ভাবলাম দেখি ঘটনা কী ?

ফরহাদ উদ্দিন এগিয়ে এলেন। চেয়ার টেনে বসলেন। সঞ্জু বলল, কিছু বলবে ?

আলাদা রিকশা নিয়ে তুই কোথায় চলে গেলি। তোর মামার বাড়ির সবাই অপেক্ষা করছিল। আমার নিজেরও শরীর খারাপ হয়ে গেল। ঐটা অবশ্যি কিছু না।

সঞ্জু বলল, মানুষের বাড়িতে বেড়াতে আমার ভালো লাগে না।

ফরহাদ উদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমারও ভালো লাগে না। তারপরেও সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ম্যান ইজ এ সোশ্যাল এনিমেল। সঞ্জু শোন, আগামীকাল তোকে অবশ্যি নিয়ে যেতে বলেছে।

বাবা, আমি যাব না।

এত করে বলছে, পাঁচ দশ মিনিট থেকে চলে আসবি। আমি অবশ্যি বলেছি

==========

ও কোথাও যেতে চায় না। তোর মামি শুনছে না।

না শুনলে কিছু করার নেই।

ফরহাদ উদ্দিন লক্ষ করলেন সঞ্জুর কপালের রগ ফুলে উঠেছে। তার মন সামান্য খারাপ হলো— সঞ্জুকে রাগিয়ে দিয়েছেন। কাজটা ঠিক হয় নি। তিনি হালকা গলায় বললেন— যেতে ইচ্ছা না করলে আমি বুঝিয়ে বলব। সমস্যা হবে না। সবারই সুবিধা-অসুবিধা আছে !

সঞ্জু বলল, বাবা তুমি শুয়ে পড়। আমি একটা জরুরি কাজ করছি।

ফরহাদ উদ্দিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তোর মামার বাড়ি যাওয়া নিয়ে তুই দুশ্চিন্তা করিস না। আমি বুঝিয়ে বলব। তোর মামি অবশ্যি বলছিল, হাসনাত সাহেবের কথা শুনলেই তুই যেতে রাজি হয়ে যাবি।

সঞ্জু বলল, হাসনাত সাহেবটা কে ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আমি তো জানি না কে ? তুই চিনিস না ?

না।

তাহলে মনে হয় ওরা কোনো গণ্ডগোল করেছে। অন্য কোনো নাম হবে। কিংবা আমি শুনতে ভুল করেছি। তোর মামি হয়তো বলেছে এক নাম, আমি শুনেছি অন্য নাম। এমন সমস্যার মধ্যে পড়েছি, বুঝলি সঞ্জু! মাথা বেশির ভাগ সময়ই আউলা হয়ে থাকে। মানুষের নাম মনে রাখা নিয়েই বেশি সমস্যা হচ্ছে। কোনো একদিন দেখব তোর নামই মনে নেই। সঞ্জুর বদলে তোকে ডাকছি ভঞ্জু। হা হা হা। ডাক্তার দেখাতে হবে।

সঞ্জু এক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ফরহাদ উদ্দিন ছেলের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার মতো হাসি দিলেন।

সঞ্জু বলল, হাসনাত সাহেবের কথা তোমাকে কে বলল ?

তোর মামি বলেছে। তোর মামির নাম দুলি। দুলালী থেকে দুলি। আশ্চর্য কাণ্ড, বুঝলি সঞ্জু! আমি দুলিকেও চিনতে পারি নি। শুরুতে ভাব করেছিলাম চিনেছি। দুলি আবার খুব চালাক মেয়ে, সে ধরে ফেলল। আমি বিরাট লজ্জার মধ্যে পড়েছি।

সঞ্জু বলল, হাসনাত সাহেব নিয়ে মামির সঙ্গে তোমার এগজেক্ট কী কথা হয়েছে ?

তেমন কোনো কথা না। তোর মামি বলল, হাসনাত নামটা শুনলেই সঞ্জু আসবে।

এটা এমন কী মহিমান্বিত নাম যে শুনলেই আমি দৌড়ে চলে যাব ?

==========

রেগে যাচ্ছিস কেন ? বোঝাই যাচ্ছে একটা কিছু ভুল হয়েছে। ভুলটা তোর মামি করে নি। আমি করেছি। তোকে তো বলেছি আমার ব্রেইন কাজ করছে না।

সঞ্জু বলল, হাসনাত নামের কাউকে আমি চিনি না।

না চিনলে তো ফুরিয়েই গেল। তুই বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়। আজ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রাত আছে। আরামে ঘুমাবি।

তিনি সঞ্জুর ঘর থেকে বের হলেন। নিজেই দরজা টেনে দিলেন। বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন— কুটুর কুটুর শব্দটা আবার শুরু হয় কি-না তার পরীক্ষা। শব্দ শুরু হচ্ছে না। তার সামান্য খারাপ লাগছে, সঞ্জুর ঘরে আরো কিছুক্ষণ বসলেই হতো। গল্পই করা হলো না। একটা জরুরি বিষয় নিয়ে ছেলের সঙ্গে আলাপ করা দরকার ছিল। অফিসের ব্যাপার। চাকরি করতে আর ভালো লাগছে না। তার আরো দুই বছর চাকরি আছে। ইচ্ছা করলে শারীরিক কারণে তিনি আর্লি রিটায়ারমেন্টে যেতে পারেন। পেনশন অতি সামান্যই পাবেন, সেটা একটা সমস্যা। তবে খুব বড় সমস্যা না। ঢাকা শহরে এখন তার নিজের বাড়ি আছে। দোতলার কিছু কাজ বাকি আছে। কাজটা শেষ ক[illegible] দোতলা ভাড়া দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে পাস করে সঞ্জু চাকরি শুরু করবে। চাকরির বাজার যদিও খুব খারাপ তবুও ব্যবস্থা একটা হবে। সালু-মামা কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে ফেলবেন। ছেলের সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা বলতে পারলে ভালো লাগত। ছেলে বড় হলে বন্ধুর মতো হয়ে যায়। বিলেত আমেরিকায় বাপ-বেটা এক টেবিলে মদ খেয়ে হাসাহাসি করে। বাংলাদেশে এটা সম্ভব না; তবে গল্পগুজব করা, হাসাহাসি করা খুবই সম্ভব।

টানা বারান্দার শেষ মাথায় বেতের একটা চেয়ার রাখা। কে যেন চেয়ারে এসে বসল। তাঁর তিন মেয়ের কোনো একজন কি ? কোন মেয়ে ? বড় মেয়ে ? তারা তিনজন সব সময় এক সঙ্গে থাকে। একজন যদি বারান্দায় এসে বসে বাকি দু'জন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে উপস্থিত হবে। মেয়ে তিনটা ছোটবেলায় তিন রকম ছিল। যতই তাদের বয়স হচ্ছে ততই তার এক রকম হয়ে যাচ্ছে। স্বভাব এক রকম হবার পেছনে যুক্তি আছে— শুধু স্বভাব না, এদের চেহারাও এখন কাছাকাছি চলে আসছে। তিনজনেরই গোল মুখ, ফোলা ফোলা গাল। তিনজনই উঁচু গলায় সামান্য ক্যানক্যানা স্বরে কথা বলে। যখন শাড়ি পরে তিনজনই একসঙ্গে শাড়ি পরে। যখন সালোয়ার কামিজ পরে তখনও তিনজনই সালোয়ার কামিজ পরে।

==========

ফরহাদ উদ্দিন খুশি খুশি মনে মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েকে একা পাওয়া গেছে, টুকটাক দু'একটা কথা মেয়ের সঙ্গে বলা যাবে। তিন বোন এক সঙ্গে থাকলে তিনি কথা বলতে পারেন না। তিনজনের দিকে একসঙ্গে তাকানো যায় না বলেই হয়তো এ সমস্যাটা হয়।

ফরহাদ উদ্দিন দূর থেকেই বললেন, কে ?

বাবা আমি সেতু।

করছিস কী তুই ?

বসে আছি।

বসে আছিস কেন ?

কী আশ্চর্য কথা! বসে থাকতে পারব না ?

ফরহাদ উদ্দিন সামান্য হকচকিয়ে গেলেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন বুঝতে পারছেন না। এটি তাঁর বড় মেয়ে না মেজো মেয়ে। তাঁর তিন মেয়ের খুবই কাছাকাছি নাম— মিতু, সেতু, নীতু। ছোটটার নাম নীতু এটা ঠিক আছে। এখানে তার গণ্ডগোল হয় না, কিন্তু বড় আর মেজোর নামে বেশ কিছুদিন ধরেই গণ্ডগোল হচ্ছে। সেতু কার নাম ? বড়টার না মেজোটার ? তিনি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে পারেন না— তুই বড় মেয়ে না মেজো মেয়ে ?

সেতু চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। বারান্দায় একটাই চেয়ার। দু'টো চেয়ার থাকলে ফরহাদ উদ্দিন আরেকটা চেয়ারে বসতেন। তার অবশ্যি দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না। মেয়ে সামান্য বেয়াদবি করছে— বাবাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে পা দোলাচ্ছে। যাই হোক এটা এমন কোনো বড় বেয়াদবি না। খুব প্রিয়জনদের সঙ্গে বেয়াদবি করা যায়।

তুই একা কেন ? তোর বাকি দুই বোন কোথায় ? থ্রি মাস্কেটিয়াস! টিভি দেখছে না-কি ?

সেতু বিরক্ত মুখে বলল, কী যে প্রশ্ন তুমি করো বাবা। রাতে খাবার সময় তো তোমাকে বললাম— মা নীতু, মিতু আপা আর কনককে নিয়ে ছোট খালার বাসায় গিয়েছে। ওদের বাসার সামনের রাস্তায় পানি জমে গেছে। আজ রাতে আর ফিরবে না।

আরে তাই তো!

তোমার ভুলোমন ভুলোমন ভাবটা দূর করো তো বাবা। বিরক্তি লাগে।

ফরহাদ উদ্দিন মেয়ের কথা বলার ভঙ্গিতে খুবই আনন্দ পেলেন। আনন্দটা বেশি হচ্ছে কারণ মেয়ের কথা থেকে তিনি ধরে ফেলেছেন এই মেয়ে হলো

==========

সেতু, তাঁর মেজো মেয়ে। একটু আগেই সে বলেছে— মা নীতু, মিতু আপা আর কনককে নিয়ে ছোট খালার বাড়িতে গিয়েছে। মিতু আপা বলছে, কাজেই মিতু সবচে বড় বোন।

প্রথম মিতু, তারপর সেতু, সবচে শেষে নীতু। কে বড় কে মেজো কে ছোট— মনে রাখার জন্য ভালো কোনো বুদ্ধি বের করা দরকার। কী বুদ্ধি করা যায় ? সব মেয়ের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে একটা শব্দ বানাতে হবে। শব্দটা মনে রাখলেই কার পরে কে বোঝা যাবে। মিতুর M, সেতুর S, নীতুর N। শব্দটা হলো MSN. সহজ বুদ্ধি। এই বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি ছোটবেলায় অনেক কিছু মনে রাখতেন।

সবাই গেছে তুই যাস নি কেন ?

আমি কেন যাই নি সেটাও বাবা আমি তোমাকে বলেছি।

কখন বললি ?

ভাত খাবার সময় বলেছি।

ভুলে গেছি। আরেকবার বল।

এক কথা একশবার বলতে ভালো লাগে না। তুমি কোনো ব্রেইন টনিক ফনিক খেয়ে ব্রেইনটা ঠিক কর তো।

রেগে আছিস কেন ? বাড়ির বড় মেয়েকে হতে হবে শান্ত ধীর স্থির। অন্যরা রাগ করলেও বাড়ির বড় মেয়ে রাগ করবে না।

বাবা আমি সেতু। আমি বড় মেয়ে না।

ও আচ্ছা তাই তো। অন্ধকারে বসে আছিস বুঝতে পারি নি। MSN, তুই মাঝখানের S.

কী বলছ তুমি ?

ফরহাদ উদ্দিন আনন্দে হাসলেন। পারিবারিক সমস্যাটা MSN দিয়ে কাভার করা যাচ্ছে।

MSN টা কী ?

আছে একটা ব্যাপার। বলা যাবে না।

সেতু বলল, না বললে নাই। বাবা যাও শুয়ে পড়ো। রাত বারোটা বাজে, এখনো হাঁটাহাঁটি করছো কেন ?

তুইও শুয়ে পড়।

আমার ঘুম আসছে না।

==========

তিন বোন একসঙ্গে থেকে থেকে এমন অভ্যাস করেছিস একা থাকলে ঘুম আসবে না। বিয়ের পর তো তোরা মহা বিপদে পড়বি। সবচে ভালো হতো কি জানিস! কোনো একটা ফ্যামিলির তিন ভাই-এর সঙ্গে তোদের তিনজনের বিয়ে দিয়ে দেয়া।

ফরহাদ উদ্দিন আনন্দে হেসে ফেললেন। হাসতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ল কেন সেতু তার ছোট খালার বাড়িতে যায় নি। সেতুর বিয়ের ফাইনাল কথা হচ্ছে। বিয়ের ফাইনাল কথায় কনে উপস্থিত থাকে না। উপস্থিত থাকা শোভন না। ছেলে দেশের বাইরে মালয়েশিয়া কিংবা জাপানে কোথায় যেন কাজ করে। বিয়েটা সেতুর পছন্দ না। তার আপত্তি হচ্ছে বড় বোনকে বাদ দিয়ে মেজো বোনের বিয়ে আগে কেন হবে ? তারচেয়েও বড় আপত্তি হলো সেতুর পছন্দের একজন ছেলে আছে। কয়েকদিন তাকে এ বাড়িতে দেখেছেন। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে দেখলেন রিকশায় করে সেতু আর ঐ ছেলে যাচ্ছে। সেতু খুব হাত টাত নেড়ে গল্প করছে আর ছেলেটা মাথা নিচু করে বসে আছে। তাঁকে দেখতে পেলে দু'জনই লজ্জা পাবে বলে তিনি দ্রুত অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। ছেলেটার নাম কী ? নাম তিনি শুনেছেন কিন্তু মনে করতে পারছেন না। সেতুকে সেই ছেলের নাম জিজ্ঞেস করা একেবারেই উচিত হবে না। কায়দা করে অবশ্যি জিজ্ঞেস করা যায়। তিনি বলতে পারেন— সেতু শোন, তোর কাছে মাঝে মাঝে একটা রোগা ছেলেকে আসতে দেখতাম। শ্যামলা রং, চশমা পরা। ছেলেটার নাম কী যেন ? এখন জিজ্ঞেস করবেন ?

ফরহাদ উদ্দিন নাম জিজ্ঞেস করবেন কী করবেন না এই নিয়ে কিছুটা ভাবলেন। যখন পুরোপুরি ঠিক করলেন জিজ্ঞেস করবেন তখন খাবার ঘর থেকে টেলিফোন বাজতে থাকল। সেতু চলে গেল টেলিফোন ধরতে। বাড়িতে টেলিফোন নতুন এসেছে। টেলিফোনে রিং হলেই সবাই খুব আগ্রহ বোধ করে। শুধু তিনি নিজে শংকিত বোধ করেন। টেলিফোন বাজলেই তাঁর মনে হয় অফিস থেকে জরুরি কল আসছে। এক্স কর্নেল হাবীবুর রহমান কোনো একটা জরুরি ফাইল খুঁজে পাচ্ছেন না। ফাইলটা ফরহাদ উদ্দিনের টেবিলে থাকার কথা।

সেতু ফিরে আসছে। নিশ্চয়ই রং নাম্বার। পরিচিত কারোর টেলিফোন এলে সেতু এত সহজে ছাড়ত না। তাঁর তিন মেয়েই টেলিফোনে কথা বলতে খুব পছন্দ করে। কোনো একজনের টেলিফোন এলে বাকি দুইজনও টেলিফোন সেটের আশে পাশে থাকে। একজন কথা বলে, বাকি দু'জন নিচু গলায় সারাক্ষণ হাসে।

সেতু বলল, বাবা তোমার টেলিফোন।

ফরহাদ উদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, আমার টেলিফোন! বলিস কী? এত রাতে কে টেলিফোন করবে?

দেখ কে করেছে?

তুই জিজ্ঞেস করিস নি?

না।

ছেলে না মেয়ে? আমার অফিসের কেউ না তো?

তুমি টেলিফোনটা ধরলেই তো জানবে ছেলে না মেয়ে। কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন?

পরিচিত কাউকে টেলিফোন নাম্বার দেই নি তো এই জন্যই অবাক হয়েছি। দিব কীভাবে, আমি নিজেই বাসার টেলিফোন নাম্বার জানি না। একটা কাগজে লিখে মানিব্যাগে রেখেছিলাম সেই কাগজটাও হারিয়ে ফেলেছি।

বাবা টেলিফোনটা গিয়ে ধরো। প্লিজ। আর ধরতে না চাইলে আমি বলে আসি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।

আমি তো ঘুমাই নাই। মিথ্যা বলাটা ঠিক হবে না। মিথ্যা বললে আয়ু যে কমে এটা জানিস?

না।

তুই যতক্ষণ মিথ্যা বলবি ততক্ষণ আয়ু কমবে। কেউ সারা দিনে পাঁচ মিনিট মিথ্যা কথা বললে তার আয়ু থেকে পাঁচ মিনিট মাইনাস করা হয়। মিথ্যাবাদী লোক কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।

ফরহাদ উদ্দিন টেলিফোন ধরতে গেলেন। রাত বাজে বারোটা একুশ। এত রাতে কে তাকে টেলিফোন করবে!

হ্যালো।

দুলাভাই স্লামালাইকুম। আমি ইস্তিয়াক। আপনি জেগে আছেন এই জন্যেই কথা বলতে চাইলাম। আপনার শরীরটা এখন কেমন?

ভালো।

দুলির কাছে শুনলাম আপনার শরীর খুবই খারাপ করেছিল— তারপরেও আপনি একা একা রওনা হয়েছেন, কাজটা ঠিক করেন নি।

এখন ভালো আছি।

আপনাকে একা ছেড়ে দিয়েও দুলি ঠিক করে নি। আমি ওর উপরও রাগ করেছি। কাল আসছেন তো দুলাভাই?

হ্যাঁ আসব।

==========

সন্ধ্যার পর থেকে আমি থাকব। কোনো কাজ রাখব না। আপনি সঞ্জুকে নিয়ে আসবেন। আমার মা ওকে খুবই দেখতে চাচ্ছেন। অসুস্থ মানুষ, মাথায় বিকার উঠে গেছে। সারাক্ষণ সঞ্জু সঞ্জু করছেন। সঞ্জু বাসায় আছে তো ?

হ্যাঁ বাসায় আছে।

ও যেন বাসা থেকে কোথাও না যায়। আসলে ওর সঙ্গেই আমার কথা বলা দরকার। আমি চাচ্ছি কথা বলার সময় আপনিও সামনে থাকেন। দুলাভাই আপনি এখনই সঞ্জুকে বলে দিন।

আমি বলে দেব। তবে ইয়ে ইস্তিয়াক শোন— ও তোমাদের এখানে যেতে চাচ্ছে না। লাজুক টাইপের তো! কোথাও যেতে চায় না। তারপরেও আমি বলব। লাজুক হোক যাই হোক, মানুষকে সামাজিকতা রক্ষা করতে হবে। মানুষ হলো সামাজিক জীব। ম্যান ইজ এ সোশ্যাল এনিমেল। ঠিক না ?

হ্যাঁ ঠিক।

তাই বলে জোর করে কিছু করানোও ঠিক না। এতেও মনের উপর চাপ পড়ে। মনের উপর চাপ পড়লে তার ফল খুবই অশুভ হয়। এই জন্যে আমার নীতি হলো কারো মনের উপর চাপ না দেয়া। বুঝলে ইস্তিয়াক, সঞ্জু আসতে না চাইলে আমি তার উপর জোর করব না। তবে আমি নিজে চলে যাব। মা'র সঙ্গেও দেখা করে আসব। অনেক দিন তাকে দেখতে যাই নি এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। দেখা হলে আমি পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

ইস্তিয়াক বলল, দুলাভাই আপনি সঞ্জুকে একটু টেলিফোনটা ধরতে বলুন— আমি বলে দিচ্ছি।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ও মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ও রাত জাগে না। সকাল সকাল ঘুমায়। এইটা তার একটা ভালো অভ্যাস। মেয়েগুলির স্বভাব আবার সম্পূর্ণ উল্টা। যত রাত জাগবে তত তাদের চোখ থেকে ঘুম চলে যাবে।

ইস্তিয়াক বলল, সঞ্জু একটা সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গে এই জন্যেই কথা বলাটা আমার জরুরি।

হাসনাত নামের কাউকে নিয়ে সমস্যা ? দুলি এই নামটা বলেছিল।

হ্যাঁ।

ফরহাদ উদ্দিন খুশি খুশি গলায় বললেন, তুমি কোথাও বিরাট একটা ভুল করছ। সঞ্জু হাসনাত নামে কাউকে চিনেই না।

ও খুব ভালো করেই চিনে। যাই হোক আপনি ওকে টেলিফোন ধরতে বলুন।

==========

ফরহাদ উদ্দিন টেলিফোন রেখে বারান্দায় এলেন।

বারান্দায় সেতু এখনো আগের জায়গায় বসে আছে। তার সামনে সঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনই নিচু গলায় কথা বলছে। কোনো হাসির কথা হচ্ছে। সঞ্জু হঠাৎ হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠছে। বাবাকে দেখে সঞ্জু হাসি থামিয়ে তাকাল। ফরহাদ উদ্দিন বললেন— রাত অনেক হয়েছে, ঘুমুতে যা। তাঁর ইচ্ছা না সঞ্জু তার মামার সঙ্গে কথা বলুক। কথা বললেই মেজাজ খারাপ হবে। রাতের ঘুমের সমস্যা হবে। তিনি সঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বললেন— তুই তো রাত জাগিস না। আজ জেগে আছিস কেন ?

সেতু বলল, বাবা তুমি আমাদের ঘুমের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন ? এই নিয়ে তিনবার ঘুমের কথা বললে। তোমার ঘুম পেলে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে। কাজের মেয়েটা মনে হয় জেগে আছে। হয়তো চা বানাচ্ছে। ফরহাদ উদ্দিনের ছেলেমেয়েদের চায়ের অভ্যাস আছে। হঠাৎ হঠাৎ তাদের চা খেতে ইচ্ছা করে। একবার রাত তিনটার সময় খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙেছে। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন বাসার সব বাতি জ্বলছে। খাবার ঘরের টেবিলে তিন মেয়ে তাদের মা-কে নিয়ে গল্প করছে। ওদের সঙ্গে সঞ্জুও আছে। সবার হাতেই চায়ের কাপ। খুবই আনন্দময় পরিবেশ। পরিবারের সবাই এক সঙ্গে বসে আনন্দ করছে— দেখতেই ভালো লাগে। আনন্দের উৎসবে পরিবারের এক আধজন সদস্য বাদ পড়ছে এটা কোনো বিষয় না। একজন দু'জন বাদ পড়তেই পারে।

ফরহাদ উদ্দিন রান্নাঘরের দিকে এগুলেন। ইস্তিয়াক টেলিফোন ধরে বসে আছে। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ঠিক না হলেও কিছু করার নেই। মানুষ সব সময় ঠিক কাজ করতে পারে না। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয়ে যায়।

যা ভাবছিলেন তাই। চুলায় চায়ের কেতলি। অপরিচিত মাঝ বয়েসী একটা মেয়ে চায়ের কাপ ধুচ্ছে। ফরহাদ উদ্দিনকে দেখে সে মাথায় কাপড় দিল। ফরহাদ উদ্দিন অপরিচিত বুয়াকে দেখে অবাক হলেন না। এ বাড়িতে প্রায়ই বুয়া বদল হয়। একদিনে তিনবার বুয়া বদলের ঘটনাও ঘটেছে। সকালে ছিল একজন। তার চাকরি চলে গেল দুপুরের আগে আগে। বিকেলে নতুন একজন এলো। রাতে ভাত খাবার সময় দেখা গেল অন্য আরেকজন।

ফরহাদ উদ্দিন ঘোমটা পরা বুয়াকে বললেন, আমাকে এক কাপ চা দিও।

বুয়া মাথা নাড়ল।

চিনি দিও না, আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। চিনি খাওয়া নিষেধ। আমাকে দিবে হালকা লিকারের চা।

==========

জ্বি আচ্ছা।

শুধু সকালবেলা দুধ চা দিবে। সেখানেও চিনি দেয়ার দরকার নেই। কনডেন্সড মিল্কে যতটুকু চিনি থাকে তাতেই আমার চলে।

জ্বি আচ্ছা।

তুমি কি রান্নাঘরে ঘুমাবে নাকি ?

বুয়া জবাব দিল না। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল। ফরহাদ উদ্দিন বললেন, রান্নাঘরে ঘুমালে অবশ্যই গ্যাসের চুলার চাবি ভালো করে বন্ধ করে ঘুমাবে। চাবি সামান্য খোলা থাকলেও গ্যাস লিক করে। রান্নাঘর ভর্তি হয়ে যায় গ্যাসে। একসিডেন্ট হয়। পত্রিকা খুললেই এরকম একটা দু'টা একসিডেন্টের খবর পাওয়া যায়। বুঝতে পারছ কি বলছি ?

জ্বি।

ফরহাদ উদ্দিন কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। আরো কিছুক্ষণ কথা বললে হতো। আরো কিছু সময় পার হতো। এর মধ্যে ইস্তিয়াক নিশ্চয়ই টেলিফোন রেখে দেবে। পুলিশের লোকের এত ধৈর্য থাকবে না যে দশ মিনিট টেলিফোন কানে নিয়ে বসে থাকবে। ইস্তিয়াকের সঙ্গে এখন আর তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তিনি যা করবেন তা হলো টেলিফোনের কানেকশন খুলে রাখবেন।

বুয়া তোমার দেশের বাড়ি কোথায় ?

মইমনসিং।

মৈমনসিংহ তো বিরাট জায়গা। মৈমনসিং-এর কোথায় ?

ফুলপুর।

ঢাকা থেকে যাতায়াত ব্যবস্থা কী ? বাস ?

জ্বি।

মৈমনসিং-এর অনেক জায়গায় গিয়েছি। ফুলপুরে যাওয়া হয় নি। দেখি একবার যাব।

বারান্দায় চটির ফটফট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ব্যস্ত পায়ে কে যেন আসছে। সেতু আসছে। তিন মেয়ে উপস্থিত থাকলে কে আসছে তাঁর জন্যে আগে ভাগে বলে দেয়া মুশকিল হতো। তিন মেয়েই একই ভঙ্গিতে দ্রুত হাঁটে।

বাবা, তুমি রান্নাঘরে কী করছ ?

চা দিতে বললাম।

চায়ের কথা বলতে এতক্ষণ লাগে। রান্নাঘর থেকে বের হও তো।

==========

ফরহাদ উদ্দিন রান্নাঘর থেকে বের হলেন। সেতু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে আছে। ফরহাদ উদ্দিন খাবার ঘরে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, হ্যালো। ও পাশ থেকে কেউ জবাব দিল না। শোঁ শোঁ শব্দ হতে থাকল। ইস্তিয়াক টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে। ফরহাদ উদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। টেলিফোন লাইন খুলে দিয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। সবচে' ভালো হয় বৃষ্টি নামার পর ঘুমুতে গেলে।

বাবা, তোমার ঘটনাটা কী বলো তো ? রাত একটার সময় কাকে টেলিফোন করছ ?

কাউকে না।

কাউকে না মানে কী ? তুমি তো কানের কাছে টেলিফোন ধরে আছ।

ফরহাদ উদ্দিন লজ্জিত মুখে টেলিফোন রাখলেন।

এই নাও তোমার চা। হঠাৎ তোমার চা খাবার ইচ্ছা কেন হলো এটাও তো বুঝছি না। তুমি তো চা খাও না।

সকালে এক কাপ খাই।

ফরহাদ উদ্দিন চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে রেখে দিলেন। রাতদুপুরে চা খাবার কোনো মানে হয় না। ঘুমটা নষ্ট হবে। সেতু এগিয়ে এসে বাবার কপালে হাত রেখে বলল, জ্বর তো নেই। তোমার কপালে হাত দিয়ে মনে হচ্ছে উল্টো আমারই জ্বর। এত ঠাণ্ডা তোমার গা। বাবা যাও, শুয়ে থাক আর ঘুরঘুর করবে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে ?

না।

ও আমি তো ভুলেই গেছি এখন তো আবার কনক তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে তোমার ভালো লাগে না।

কী যে তুই বলিস!

ঠিকই বলি। তুমি কনককে গোপনে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে নিয়ে এসেছ।

ঐ বেচারি কখনো চিড়িয়াখানায় যায় নি। আর তোরা তো চিড়িয়াখানা পছন্দ করিস না। চিড়িয়াখানায় গেলে পশুদের গন্ধে তোদের বমি আসে।

কনককে তুমি এত পছন্দ কর কেন বাবা ?

দুঃখি মেয়ে। এই জন্যে।

মা'র ধারণা কনক দেখতে অনেকটা আমাদের সৎমার মতো। বাবা এটা কি সত্যি ?

==========

ফরহাদ উদ্দিন জবাব দিলেন না। এই ভাবে তিনি আগে চিন্তা করেন নি। মেয়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে সত্যি। পারুলের মুখ লম্বাটে ছিল। কনকের মুখও লম্বাটে।

বাবা।

হুঁ।

তোমার স্বভাবের মধ্যে গোপন করার একটা ব্যাপার আছে। এটা ভালো না।

আমি কী গোপন করলাম ?

অনেক কিছুই গোপন কর। এতে মা খুব কষ্ট পায়। মা হয়তো আমাদের সৎ মা'র মতো না। কিন্তু মা খুবই ভালো মেয়ে। তাকে কষ্ট দিও না। যাও ঘুমুতে যাও।

তিনি বাধ্য ছেলের মতো ঘুমুতে গেলেন। দরজা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল। গভীর রাতে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করাতেও আনন্দ। তবে আজ আনন্দটা ঠিকমতো পাচ্ছেন না। বড় একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা চেপে বসেছে মাথায়। নাম নিয়ে কি সমস্যা ? আচ্ছা ইংরেজি শব্দটা যে তৈরি করেছেন সেটা কি SMN না-কি MSN ? এটা তো দেখি আরেক যন্ত্রণা হলো।

সঞ্জু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে এর মানে কী ? সে কী ঝামেলায় জড়াবে। পলিটিক্স যারা করে তারা ঝামেলায় জড়ায়, বিজনেস ম্যানেরা ঝামেলায় জড়ায়। সঞ্জু এর কোনটাতেই নেই। রাত ন'টা বেজে গেছে সঞ্জু বাসায় ফিরে নি এরকম কখনো হয় নি। এই ছেলে কী ঝামেলায় পড়বে। সমস্যাটা কী ? ইস্তিয়াকের কাছ থেকে জেনে নেয়া ভালো ছিল।

তাঁর মাথা দপদপ করছে। সমস্যার পুরো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঘুম আসবে না। ঘুমের সমস্যা তার নেই, তবে মাঝে মাঝে খুব ছোট ছোট জিনিস তাকে যন্ত্রণা দেয়। কেউ তাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করল— তিনি উত্তর বের করতে না পেয়ে রাতে বিছানায় জেগে বসে থাকলেন। ধাঁধা জিজ্ঞেস করত পারুল। মশারি খাটাতে খাটাতে জিজ্ঞেস করল, এই বলো তো দেখি—

কুটুর মুটুর শব্দ হয়
আসলে তা শব্দ নয়।

জিনিসটা কী ?

জানি না তো জিনিসটা কী ?

==========

চিন্তা করে বের কর। কুটুর মুটুরের মধ্যেই উত্তরটা আছে।

এটা খুবই কঠিন ধাঁধা, এটা পারব না।

চেষ্টা না করেই বলছ পারব না— চেষ্টা কর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাব।

তখন তাঁর আর ঘুম আসে না। মাথার ভেতর ধাঁধা চলতে থাকে। তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন। তাঁর পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায় পারুল।

জেগে রাত পার করার এই অভ্যাস সঞ্জুরও আছে। ছোট বয়স থেকেই আছে। মা'র মৃত্যুর পর তিনি সঞ্জুকে নিয়ে ঘুমুতেন। সঞ্জুর আলাদা বিছানা হলো সঞ্জু ক্লাস ফাইভে উঠার পর। তখন হঠাৎ হঠাৎ ঘুমে ভেঙে গেলে তিনি লক্ষ করেছেন সঞ্জু তাঁর গা ঘেঁষে চুপচাপ বসে আছে। যেন পাথরের মূর্তি। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময়ও মানুষের শরীর সামান্য নড়াচড়া করে— সঞ্জুর তাও হচ্ছে না। সে মশারির একটা কোনার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

সঞ্জু কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি।

বাথরুমে যাবি ?

না।

পানি খাবি ?

না।

ঘুম আসছে না ?

আসছে।

আসছে তাহলে জেগে বসে আছিস কেন ?

জানি না।

কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ ?

না।

স্কুলে মাস্টার বকেছে ?

না।

শুয়ে থাক, পিঠ চুলকে দেই।

আচ্ছা।

তিনি অনেকক্ষণ পিঠ চুলকে দেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এক সময় নিশ্চিত হয়ে যান সঞ্জু ঘুমুচ্ছে। তখন কোমল গলায় বলেন, সঞ্জু ঘুমাচ্ছিস ?

সঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে বলে, হুঁ।

==========

ঘুমের মধ্যে কথা বলছিস কীভাবে ?

আমি ঘুমের মধ্যে কথা বলতে পারি।

ফরহাদ উদ্দিন আনন্দে হেসে ফেলেন। শিশুদের সঙ্গে জীবনযাপন করা খুব আনন্দের ব্যাপার। না এখানে ভুল করা হলো, মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন করাই আনন্দের। সঞ্জুর সঙ্গে এখন গিয়ে টুকটাক গল্প করতে পারলে তাঁর আনন্দই হবে। আগের দিনের মতো বিছানায় নিজের পাশে নিয়ে ঘুমুতে পারলে আরো আনন্দ হবে। সঞ্জু খালি গায়ে শুয়ে থাকল, তিনি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন— সঞ্জু একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব দেখি উত্তর দিতে পারিস কি-না—

"কুটুর মুটুর শব্দ হয়
আসলে তা শব্দ নয়।"

ধাঁধাটা তোর মা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি জবাব দিতে পারি নি। তোর তো বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশি, তুই হয়তো পারবি। আচ্ছা আয় এক কাজ করি দু'জনে মিলে ভেবে ভেবে বের করি উত্তরটা কী ? বুঝলি সঞ্জু, তোর মা মোটামুটি অদ্ভুত মেয়ে ছিল— ধাঁধা ধরত কিন্তু ধাধার উত্তর দিত না। আমরা কী করি ? একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, উত্তর না পারলে নিজেরা বলে দেই। তোর মা এই কাজটা কখনো করত না। কত ধাঁধা যে জিজ্ঞেস করেছে একটারও উত্তর দিয়ে যায় নি। সবগুলি এখন মনেও নেই। ও আচ্ছা আরেকটা মনে পড়েছে—

"আকাশে জন্মে কন্যা
পাতালে মরে
হাত দিয়া ধরতে গেলে
ছটর ফটর করে।"

কি পারবি ? সহজ না, কঠিন আছে। তোর মা যে সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করত সবই কঠিন।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি পড়ছে। শহরে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় না। রাত গভীর হলেই শুধু শোনা যায়। জানালা দিয়ে শীতল হাওয়া আসছে। শরীরটা মনে হয় খারাপ করছে। জ্বর সত্যি সত্যি আসছে। জ্বর না এলে এত ঠাণ্ডা লাগার কথা না। গায়ে চাদর আছে তারপরেও শরীর কাঁপছে। ইস্তিয়াকদের ওখানে কাল মনে হয় যাওয়া হবে না। জ্বর নিয়ে তো কেউ আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় না। দুলি বেচারি বাইম মাছ রান্না করে বসে থাকবে। কিছু করার নেই। অসুস্থ অবস্থায় অতি সুখাদ্যের কথা ভাবলেও বমি বমি ভাব হয়।

বারান্দায় কেউ একজন হাঁটাহাঁটি করছে। সঞ্জু কি হাঁটছে ? তাকে ডেকে ঘরে নিয়ে এলে কেমন হয় ? অসুস্থ বাবার পাশে খানিকক্ষণ বসল। এতে ক্ষতি

==========

তো কিছু নেই। বরং কথায় কথায় জিজ্ঞেস করা যেতে পারে সে কোনো সমস্যায় পড়েছে কিনা। প্রেম বিষয়ক কোনো সমস্যা না তো ? তবে ইস্তিয়াকের গলার স্বরে মনে হচ্ছিল জরুরি কিছু। ফরহাদ উদ্দিন উঠে বসলেন। খাটে হেলান দিয়ে অন্ধকারে বসে রইলেন। সঞ্জুর মায়ের একটা ধাঁধারও তিনি সমাধান বের করতে পারেন নি। এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই। সমাধান বের করলেও সেই সমাধান তাকে জানাতে পারবেন না। তবু উত্তরটা জানা থাকল। কন্যা বাস করে আকাশে, তার মৃত্যু হয় পাতালে। হাত দিয়ে ধরলে সে ছটর ফটর করে। কী হতে পারে ? বৃষ্টি কি হতে পারে ? বৃষ্টির জন্ম আকাশে, তার মৃত্যু মাটিতে কিন্তু হাত দিয়ে ধরলে সে তো ছটর ফটর করে না।

==========

হাসাহাসির শব্দে ফরহাদ উদ্দিনের ঘুম ভাঙল।

তিনি অনুভব করলেন সারা বাড়িতে আজ তুমুল উত্তেজনা। মেয়েরা ছোটাছুটি করছে। একজন দরজায় ধাক্কা খেয়েছে, ব্যথা পেয়েও হাসছে। তুমুল আনন্দের মুহূর্তে শারীরিক ব্যথা-বেদনাও আনন্দময় মনে হয়।

বিরাট আনন্দের কিছু ঘটেছে। কী ঘটেছে তিনি অনুমান করার চেষ্টা করলেন। অনুমান করা গেল না। বালিশের নিচে রাখা হাতঘড়িতে সময় দেখলেন— এগারোটা দশ। তাঁর আঁতকে উঠার কথা। অফিস শুরু হয় ন'টায়। কোনো কারণ ছাড়াই অফিস কামাই হলো। কিন্তু তিনি আঁতকে উঠলেন না, যে ভাবে শুয়ে ছিলেন সেই ভাবেই শুয়ে রইলেন।

মেয়েরা হাসছে। ছোটাছুটি করছে। শুনতে ভালো লাগছে। তবে শরীর ক্লান্ত। কাল সারা রাত জেগে ছিলেন। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এখনো কাটছে না। তবে একটা ভালো কাজ হয়েছে— সকালের আলোয় মনে হচ্ছে গত রাতটা জেগে কাটানোর কোনো কারণ ছিল না। ভুল বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা। ইস্তিয়াক সঞ্জুকে চিনে না। তিনি চেনেন।

ফরহাদ উদ্দিন বিছানা থেকে নেমে দরজা খুললেন। রাহেলা বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। তিনি চায়ের কাপ হাতে উঠে এলেন। রাহেলার মুখ হাসি হাসি। আনন্দময় যে ঘটনায় বাড়ির সবাই উল্লসিত সে ঘটনায় রাহেলারও ভূমিকা আছে। ঘটনাটা কী হতে পারে ?

তোমার ঘুম শেষ পর্যন্ত ভাঙল ? কতবার যে দরজা ধাক্কানো হয়েছে। ঘটনা কী বলো তো ? অফিসও তো মিস করেছ! সেতু বলল তুমি সারা রাত ঘুমাও নি। সে রাত চারটার সময় ঘুম ভেঙে পানি খেতে খাবার ঘরে এসে দেখে তুমি বারান্দায় বসে আছ।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, শরীরটা একটু খারাপ।

শরীর খারাপ সে তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমার মনে হয়

==========

ডায়াবেটিস আরো বেড়েছে। ব্লাড সুগারটা আরেকবার দেখাও। এক কাজ কর, আজ যখন অফিসে যাও নি— আজই যাও।

দেখি।

মিতু বাবাকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে নাকি গলায় বলল, বাঁবাঁ চাঁ খাঁবে ? চাঁ বাঁনিয়ে আঁনব ?

ফরহাদ উদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, এই মেয়ে নাকি গলায় কথা বলছে কেন ?

রাহেলা মুখের হাসি চাপতে চাপতে বললেন, সেতুর যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে সে নাকি নাকে কথা বলে। এই জন্যে সবাই নাকে কথা বলা প্র্যাকটিস করছে।

নাকে কথা বলে ?

আরে না, নাকে কথা বলবে কী জন্যে ? তোমার মেয়েরা হয়েছে জগতের ফাজিল। সবকিছু নিয়ে ফাজলামি করে।

সেতুর ছেলে পছন্দ হয়েছে ?

মুখে বলছে ছেলে পছন্দ হয় নি। নাকে কথা বলে— কাজেই ভূত-টাইপ ছেলে। আমার ধারণা— খুবই পছন্দ। দশটার সময় ছেলের টেলিফোন এসেছে। সেতু এখনো কথা বলছে।

বিয়ে কবে ?

বিয়ে কবে সেটা তো তুমি ঠিক করবে। তুমি মেয়ের বাবা। সবকিছু আমি ঠিক করব নাকি ?

নীতু বারান্দায় ছুটে এসে মাকে বলল, মাঁ সেঁতু আঁপা এতক্ষণ আঁপনি আঁপনি কঁরে কঁথা বঁলছিল। এখন তুঁমি তুঁমি কঁরে বঁলছে। এঁসো, শুঁনে যাঁও। কী যে হাঁস্যকর লাঁগছে।

রাহেলা বললেন, তোরা শোন, আমি কী শুনব ?

আঁড়াল থেঁকে শুঁনবে। খুব মঁজা পাঁবে।

নীতু এসে মায়ের হাত ধরে টানছে। রাহেলা এমনভাবে এগুচ্ছেন যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় যাচ্ছেন। অথচ তাঁর চোখে মুখে আগ্রহ ফেটে বের হচ্ছে।

ফরহাদ উদ্দিন শান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর কাছে মনে হলো সংসার অতি সুখের জায়গা। যে-কোনো মূল্যে এই সংসার টিকিয়ে রাখতে হয়। রাহেলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিরে আসছেন। ফরহাদ উদ্দিনের হঠাৎ ইচ্ছা করল

==========

মেয়েদের মতো নাকি সুরে কথা বলে রাহেলাকে চমকে দেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি যদি বলেন—'কী হঁয়েছে মুঁখে আঁচল চাঁপা দিয়ে হাঁসছ কেঁন ?' তাহলে কেমন হয় ? না, ভালো হয় না। মেয়ে-জামাইকে নিয়ে রসিকতা করা যায় না।

রাহেলা বললেন, কী হয়েছে, এমন খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন ? হাত মুখ ধুয়ে এসো নাশতা খাই। আমি তোমার জন্যে এখনো নাশতা খাই নি।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, কনক কোথায় ?

কনক কলেজে গেছে। ওর পরীক্ষার রুটিন দিবে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আজ যখন অফিস মাটিই হলো তখন এক কাজ করা যায়। চল আমরা সবাই মিলে চিড়িয়াখানায় যাই।

কখন যাবে ?

এখন চল।

সেতু বলছিল তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে— এখন তো মনে হচ্ছে আসলেই তাই। দুপুরের এই রোদে কেউ চিড়িয়াখানায় যায়! আর তোমার মেয়েদের কি এখন চিড়িয়াখানায় যাবার বয়স আছে ? বরং এক কাজ কর— চল রাতে সবাইকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাই।

চল যাই।

ছেলেটাকেও খেতে বলি। তুমি তো তাকে দেখ নি। দেখবে, কথা টথা বলবে।

আচ্ছা বলো।

রাহেলা আনন্দিত ভঙ্গিতে এই খবর বড় মেয়েকে দিতে গেলেন আর তখনই ফরহাদ উদ্দিনের মনে পড়ল আজ তাঁর দুলিদের বাসায় যাবার কথা। ইস্তিয়াক কী যেন বলবে। দুলি তাকে বাইম মাছ খাবার দাওয়াত দিয়েছে। ভালো ঝামেলা হয়ে গেল।

ফরহাদ উদ্দিন ঠিক করলেন— সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ও বাড়িতে যাবেন। আধ ঘণ্টাখানিক থেকে চলে আসবেন। দুলিকে বলবেন মাছের তরকারিটা ফ্রিজে রেখে দিতে। পরে কোনো একদিন এসে খেয়ে যাবেন। দুলিকে বিষয়টা বুঝিয়ে বললে সে বুঝবে। দুলি অবুঝ মেয়ে না।

সঞ্জুর ঘরের দরজা খোলা। চায়ের কাপ নিয়ে ফরহাদ উদ্দিন ছেলের ঘরের দিকে এগোলেন। তাঁর কাছে মনে হলো হঠাৎ করে অফিস বাদ দিয়ে ভালোই

==========

হয়েছে— কাজের দিনের সংসারের স্বাদটা পাওয়া যাচ্ছে। ছুটির দিনের সংসার এক রকম আবার কাজের দিনের সংসার আরেক রকম।

কী করছিস সঞ্জু ? বলতে বলতে ফরহাদ উদ্দিন ছেলের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সঞ্জু সিগারেট টানছিল। জানালা দিয়ে সিগারেট ফেলে দিয়ে বাবার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। তার হাতে কালো রঙের বড় একটা হ্যান্ডব্যাগ। সে হ্যান্ডব্যাগে কাপড় রাখছে। ফরহাদ উদ্দিনের সামান্য মন খারাপ হলো। ছেলেটা আরাম করে সিগারেট খাচ্ছিল— বাবাকে দেখে ফেলে দিতে হলো।

যাচ্ছিস নাকি কোথাও ?

হুঁ।

কোথায় যাচ্ছিস ?

কোলকাতা যাব।

তোর তো ভাইবা বাকি আছে।

ভাইবার এখনো ডেট হয় নি।

হঠাৎ কোলকাতা যাচ্ছিস কেন ?

সঞ্জু জবাব দিল না। ছেলেকে নিয়ে এই সমস্যা— একবার প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যায় না। একই প্রশ্ন দু'বার তিনবার করতে হয়।

তোর মামা বলছিল তোকে নিয়ে তার বাসায় যেতে। তোর সঙ্গে কী নাকি জরুরি কথা।

সঞ্জু বিরক্ত মুখে বলল, তোমাকে তো একবার বলেছি যাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে, যেতে না চাইলে যাবি না। কোলকাতা কখন যাচ্ছিস ?

রাত ন'টায় বাস ছাড়ে।

টাকা পয়সা লাগবে ?

না।

বিদেশে যাচ্ছিস, হাতে কিছু টাকা পয়সা তো থাকা দরকার।

সঞ্জু জবাব দিল না। তার ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। সে বাবার সামনের চেয়ারে বসল। টেবিলে পিরিচ দিয়ে ঢাকা চায়ের কাপ। সে চায়ে চুমুক দিল। পুরো ব্যাপারটা ফরহাদ উদ্দিন খুব আগ্রহ করে দেখলেন। পিরিচে ঢাকা চায়ের কাপ আগে চোখে পড়ে নি। বাপ ছেলে দু'জনে এক সঙ্গে চা খাচ্ছে। এই ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগছে। ফরহাদ উদ্দিন খুশি খুশি গলায় বললেন— তোর বেড়াতে ভালো লাগে ?

==========

সঞ্জু জবাব দিল না। বাবার দিকে তাকালও না। মাথা নিচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। ফরহাদ উদ্দিন আনন্দিত গলায় বললেন— বেড়ানোর শখ ছিল আমার বন্ধু বদরুলের। সারাক্ষণ নানান প্ল্যান প্রোগ্রাম— অমুক জায়গায় যাবে তমুক জায়গায় যাবে। একবার তো তার পাল্লায় পড়ে বিনা পাসপোর্টে আগরতলা চলে যাচ্ছিলাম। ত্রিপুরার মহারাজার বাড়ি দেখবে। সে এক ইতিহাস...

ফরহাদ উদ্দিন দীর্ঘ ইতিহাস বলতে পারলেন না। সঞ্জু তার আগেই উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, আমি এখন বের হবো।

তোর কোলকাতা রওনা হবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হবে না ? আমাকে আবার সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ইস্তিয়াকের ওখানে যেতে হবে। দুলি আমার জন্য বাইম মাছ রান্না করবে। দুলিদের ওখানে খাওয়া যাবে না। রাতে বাসার সবাই বাইরে খেতে যাচ্ছে। তুই থাকলে ভালো হতো। পারিবারিক অনুষ্ঠানে সবার উপস্থিত থাকা দরকার।

চায়ের কাপ হাতে ফরহাদ উদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। সঞ্জু মনে হয় বিরক্ত হচ্ছে। তিনি ঘরে বসে আছেন বলে সে বের হতে পারছে না। সে বাইরে গেলে ঘর তালা দিয়ে যায়।

সঞ্জু বলল, বাবা কোলকাতা থেকে তোমার জন্য কী আনব ?

ফরহাদ উদ্দিনের মনটা আনন্দে ভরে গেল। ছেলে এখনো বাইরে যায় নি। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে কার জন্য কী আনবে। এরই নাম মায়া। মানুষ যেখানেই থাকুক তার মন পড়ে থাকে সংসারে। ফরহাদ উদ্দিন গাঢ় স্বরে বললেন, কিছু আনতে হবে না রে ব্যাটা। তুই ভালোমতো থাকিস। রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করবি না। কোলকাতা শহরের রোদ খুবই কড়া— এক ঘণ্টায় চামড়া কালো করে ফেলে। আমাদের অফিসের হাবীবুর রহমান সাহেবের কাছে শুনেছি।

সারাটা দিন ফরহাদ উদ্দিনের খুব আনন্দে কাটল। তাড়াহুড়া করে পত্রিকা পড়তে হলো না। আরাম করে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পত্রিকা পড়লেন। আজকাল সব পত্রিকার সঙ্গেই একটা করে ম্যাগাজিন থাকে। ম্যাগাজিন পড়েও আনন্দ পেলেন। একটু পর পর কনক এসে জিজ্ঞেস করছে, চাচাজি চা খাবেন ? তিনি চা খান না, তারপরেও দুপুর বারোটার মধ্যে তিন কাপ চা খেয়ে ফেললেন।

কনক মেয়েটা অন্যদের মতো না। সে চায়ের কাপ রেখেই চলে যায় না।

==========

যতক্ষণ চা খাওয়া না হয় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তার সঙ্গে গল্পগুজব করা যায়। কনকের এই স্বভাবটা আগে লক্ষ করলে তিনি ঘন ঘন চা দিতে বলতেন।

ফরহাদ উদ্দিন চা খেতে খেতে অনেক গল্প করলেন। সব গল্পই সামান্য উদ্দেশ্যমূলক। আকারে ইঙ্গিতে সঞ্জুর প্রশংসা। এই মেয়েটার মন সঞ্জুর প্রতি কৌতূহলী করার সূক্ষ্ম চেষ্টা।

বুঝলে মা, সঞ্জুর সঙ্গে তোমার স্বভাবের বেশকিছু মিল আছে। মিলগুলো তুমি লক্ষ করেছ ?

না।

একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের মিল-অমিল লক্ষ করতে হয়। এতে অনেক কিছু শেখা যায়। সঞ্জুর সঙ্গে তোমার মিলগুলো হলো— সঞ্জু কথা কম বলে। তুমিও কথা কম বলো। সঞ্জু শান্ত, তুমিও শান্ত। সঞ্জুর সঙ্গে তোমার বাবারও বেশকিছু মিল আছে। সঞ্জু বেড়াতে পছন্দ করে, তোমার বাবাও বেড়াতে পছন্দ করত। আজ এখানে কাল ওখানে। তোমার বাবার পাল্লায় পড়ে একবার যে পাসপোর্ট ছাড়া প্রায় আগরতলা চলে গিয়েছিলাম সেই গল্প বলেছি ?

না।

গল্প না, যাকে বলে ইতিহাস। প্রথম গেলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বদরুল করল কী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানা থেকে আমার আর তার নামে দু'টা পারমিট বের করল। সেখানে লেখা আমাদের দু'জনের দু'টা গাই গরু সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেছে। গরু দু'টা খুঁজে আনার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সীমান্তের ওপারে থাকার পারমিট। স্থানীয় ভাষায় এর নাম 'গরু পাসপোর্ট'। আমার তো সাহস কম। আমি বদরুলকে বললাম— গরু পাসপোর্ট নিয়ে আমি যাব না। বদরুল রাগ করে আমাকে ফেলে একাই চলে গেল। তার চলে আসার কথা সন্ধ্যার মধ্যে, ফিরল আট দিন পরে। সে ত্রিপুরা মহারাজার বাড়ি, নীর মহল, আরো কী সব হাবিজাবি দেখে এসেছে। এদিকে টেনশানে আমার প্রথমে হয়েছে ডায়রিয়া, তারপর হয়ে গেল রক্ত আমাশা। সঞ্জুরও এরকম অভ্যাস আছে। কাউকে কিছু না বলে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে চলে গেল। একবার ছয়দিন তার কোনো খোঁজ নেই। দরজা তালাবন্ধ করে চলে গেছে, কাউকে কিছু বলেও যায় নি। সেবারও টেনশানে আমার ডায়রিয়া হয়ে গেল। ডায়রিয়া থেকে রক্ত আমাশা। এই আমার এক সমস্যা।

দুপুরে খাবার পর ফরহাদ উদ্দিন খুবই আরাম করে ঘুমুলেন। ঘুম ভাঙল

==========

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তাদের খাবার কথা রাত ন'টায়। হাতে সময় আছে। তিনি ইস্তিয়াকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এখন বাজে ছ'টা। যেতে আসতে এক ঘণ্টা। তিনি থাকবেন আধঘণ্টা। সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসবেন।

ঘর থেকে বেরুবার মুখে রাহেলার সঙ্গে দেখা। রাহেলা অবাক হয়ে বললেন, এখন বের হচ্ছো কোথায় ? রাতের দাওয়াতের কথা মনে আছে ?

ফরহাদ উদ্দিন হাসিমুখে বললেন, মনে আছে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরব।

রাস্তায় যদি বেলি ফুলের মালা পাও আমার জন্য নিয়ে এসো। বেলি ফুল পাওয়া যাচ্ছে— এখন পর্যন্ত আমি চোখে দেখলাম না।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তুমি আগেও বলেছিলে— মনে ছিল না। আজ অবশ্যই নিয়ে আসব।

ইস্তিয়াক বিস্মিত হয়ে বলল, আপনাকে বলেছিলাম সঞ্জুকে নিয়ে আসতে, ও কোথায় ?

ও গেছে কোলকাতায়। বিকেল পাঁচটায় ফ্লাইট। চারটায় ছিল রিপোর্টিং। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম ওকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসব। যত কাছেই হোক বিদেশ যাত্রা।

আসবে কবে ?

আসবে কবে তাতো জানি না। তবে বেশিদিন থাকবে না— তার ভাইবা বাকি আছে। পড়াশোনার ব্যাপারে এই ছেলে আবার খুবই সিরিয়াস।

ইস্তিয়াকের ভুরু কুঁচকে আছে। মানুষটাকে সামান্য বিরক্ত মনে হচ্ছে। ফরহাদ উদ্দিন ইস্তিয়াকের বিরক্তির কারণ ধরতে পারছেন না। সঞ্জুকে আনা হয় নি— বিরক্তি কি এই কারণেই ? আজ আসে নি, অন্য আরেক দিন আসবে।

ইস্তিয়াক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, দুলাভাই আপনাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন ? মনে হচ্ছে আপনি খুবই আনন্দিত।

আমি বেশির ভাগ সময় আনন্দেই থাকি। অফিসেও এখন ঝামেলা কম। ও আচ্ছা, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি— আমার দু'নম্বর মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছেলের সবই ভালো। একটু বোধহয় নাকে কথা বলে। এটা কোনো সমস্যা না। মেয়ের ছেলেকে পছন্দ— এটাই বড় কথা।

==========

ভালো তো।

আমার অবশ্যি ইচ্ছা ছিল প্রথমে সঞ্জুর বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনব, তারপর মেয়ে বিয়ে দেব। সেটা আর হলো না। সঞ্জু চাকরি বাকরি ঠিক না করলে তার বিয়ে দেয়া ঠিক না। তুমি কী বলো ?

ইস্তিয়াক জবাব না দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। ফরহাদ উদ্দিন তাকিয়ে থাকলেন। তিনি তার সামনে বসে থাকা গম্ভীর চেহারার এই মানুষটাকে ছোটবেলায় দেখেছেন। লাজুক ধরনের ছেলে ছিল। একবার তাঁকে এসে বলল, দুলাভাই দড়ি কাটার একটা ম্যাজিক দেখবেন ? দড়ি কেটে জোড়া লাগিয়ে দেব।

তিনি 'হ্যাঁ' বলার আগেই সে দড়ি কেটে জোড়া লাগিয়ে ফেলল। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এরকম আশ্চর্য ম্যাজিক তিনি জীবনে কমই দেখেছেন। সেই ছেলে আজ গম্ভীর মুখে সামনে বসে আছে। একটার পর একটা সিগারেট টানছে। পুলিশের বড় অফিসার ভাবটা চেহারাতে চলে এসেছে। কারণ ফরহাদ উদ্দিনের তাকিয়ে থাকতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অথচ ভয় লাগার কিছু নেই। ইস্তিয়াক তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অনেকদিন যোগাযোগ নেই, তাতে কী হয়েছে! আত্মীয় মানে আত্মীয়। ইস্তিয়াকের পরনে পুলিশের পোশাকও নেই যে ভয় লাগাবে। লুঙ্গির উপর একটা গেঞ্জি পরেছে। পুলিশের অফিসার লুঙ্গি পরে বসে আছে ভাবতে জানি কেমন লাগছে।

ইস্তিয়াক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সঞ্জু যে বিরাট এক ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে এটা বলার জন্যেই তাকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। সঞ্জুর এক বন্ধু, তার নাম টগর। সে পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। সেখানে সঞ্জুর নাম আছে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, হাসনাত সাহেবকে নিয়ে কোনো ঝামেলা ? সঞ্জু হাসনাত সাহেবের সঙ্গে কী গণ্ডগোল করেছে আমি জানি না। তবে আমার ধারণা তুমি একটা ভুল করছ। হাসনাতকে সে চিনে না। টগর নামের যে ছেলেটা সঞ্জুর কথা বলেছে সে অন্য কোনো সঞ্জুর কথা বলেছে। ঢাকা শহরে অনেক সঞ্জু আছে। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন আমার সঙ্গে আরো দুইজন ফরহাদ পড়ত। এক ক্লাসে তিন ফরহাদ। ভেবে দেখ কী অবস্থা! আমাদের তিনজনকে আলাদা করার জন্যে ছাত্ররা আমাদের কী ডাকত জানো ? একজনকে ডাকত 'বে ফরহাদ'। 'বে ফরহাদ' মানে বেকুব ফরহাদ। আরেকজনের নাম ছিল 'বু ফরহাদ'। 'বু ফরহাদ' মানে বুদ্ধিমান ফরহাদ। আর থার্ডজনের 'গু ফরহাদ'। ওর মুখ থেকে খুব দুর্গন্ধ আসত বলে ওর নাম হয়ে গেল 'গু ফরহাদ'। মুখে 'গু

==========

ফরহাদ' বলতে খারাপ লাগে বলে আমরা বলতাম G ফরহাদ। G হলো গু।

ফরহাদ উদ্দিন শরীর দুলিয়ে হাসছেন। ইস্তিয়াকের মুখে হাসি নেই। ফরহাদ উদ্দিন খুবই অবাক হয়ে দেখলেন— ইস্তিয়াকেরও কপালের মাঝখানের দু'টা রগ ফুলে উঠেছে।

কপালের রগ ফুলানোর এই ব্যাপারটা সঞ্জু নিশ্চয়ই তার মামাদের কাছ থেকে পেয়েছে। ছেলেমেয়েরা মামাদের দিকগুলি বেশি পায়।

দুলাভাই, আপনি মন দিয়ে আমার কথা শুনুন।

মন দিয়েই তো শুনছি।

যতটুকু মন দিয়ে শুনছেন তার চেয়েও একটু বেশি মন দিন। হাসনাত নামের এক ভিডিও ব্যবসায়ী খুন হয়েছে। যে তিনজন মিলে তাকে খুন করেছে সেই তিনজনের একজন সঞ্জু।

ফরহাদ উদ্দিন তাকিয়ে আছেন। তিনি ইস্তিয়াকের কথা শুনতে পাচ্ছেন। আবার একই সঙ্গে আরো একজনের কথা শুনতে পাচ্ছেন, তবে বুঝতে পারছেন না কারণ সে বিড়বিড় করছে। ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাথা পুরোপুরি খারাপ হবার আগে মাথার ভেতর নানান রকম শব্দ হয়।

ইস্তিয়াক ঝুঁকে এসে বলল— ভালো করে মনে করে দেখুন এপ্রিল মাসের নয় তারিখ থেকে তের তারিখ পর্যন্ত সে বাড়িতে ছিল না। মোট পাঁচ দিন। মনে পড়েছে ?

ফরহাদ উদ্দিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ফরহাদ উদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন, আমি তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। সঞ্জু তো হাসনাত নামের কাউকে চিনেই না। হাসনাতের নাম শুনে সে আকাশ থেকে পড়েছে।

ইস্তিয়াক বিরক্ত গলায় বলল, দুলাভাই আপনি বোকা নাকি বোকার ভান করছেন এটা বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা আপনি ভান করছেন। ভানে কাজ দেবে না। বাস্তব চিন্তা করতে হবে। সঞ্জু লুকিয়ে কোলকাতায় বসে আছে। কত দিন সে ওখানে থাকবে— এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক বছর! তাকে তো দেশে আসতে হবে। দেশে এলেই এরেস্ট হবে। আর যদি তার অনুপস্থিতিতে মামলা চলে— তাহলে ডেথ পেনাল্টি তো হবেই। ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

ফরহাদ উদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ইস্তিয়াকের কোনো কথাই এখন তাঁর মাথায় ঢুকছে না। এখন মনে হচ্ছে ইস্তিয়াক ফিসফিস করে কথা

==========

বলছে। বেশির ভাগ কথাই শব্দহীন। ঠোঁট নড়ছে কিন্তু শব্দ হচ্ছে না। তাঁর নিজের মাথাও এখন সামান্য দুলছে। এটা হচ্ছে সিগারেটের গন্ধে। সিগারেটের ধোঁয়া তার সহ্য হয় না। অথচ একটা লোক তার সামনে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

আপনি ভেঙে পড়বেন না। আমি আছি, আমার যা করার আমি করব। ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেয়া যাবে না। এরেস্ট হয়ে কোর্ট কাছারি হয়ে ছাড়া পাওয়া এক কথা আর একেবারেই জানাজানি না হওয়া আরেক কথা। বুঝতে পারছেন কী বলছি ?

পারছি।

কাজেই শুরুতেই টাকা দরকার। ভালো এমাউন্টের টাকা দরকার।

ও আচ্ছা।

পুলিশের যে অফিসার এই কেইসটা ইনভেস্টিগেট করছে তাকে আমি সঞ্জুর কথা বলেছি। উনার নাম মকবুল হোসেন। ডিবির পুলিশ ইন্সপেক্টর। কেইসটা চলে গেছে ডিবিতে। মকবুলকে বলা হয়েছে। ফাইনাল রিপোর্টে যেন সঞ্জুর নাম না যায়।

ফাইনাল রিপোর্টটা কী ?

ফাইনাল রিপোর্ট হলো পুলিশ তদন্ত করে একটা চার্জশিট দেয়। মকবুল কাজটা করবে। তবে তাকে আলাদা করে টাকা দিতে হবে। কোনো উপায় নেই। ছয় সাত লাখ টাকা খরচ হবে। ঘটনাটা কী ঘটেছিল শুনতে চান ?

কী ঘটনা ?

হাসনাতের খুন হবার ঘটনা। এরা তিনজনে মিলে কাজটা কীভাবে করল।

ফরহাদ উদ্দিন কিছু বললেন না। এখন তার পেটে মোচড় দিচ্ছে। নিঃশ্বাসেও সামান্য কষ্ট হচ্ছে। মাথায় পানি ঢালতে পারলে ভালো হতো।

দুলাভাই, মন দিয়ে শুনুন কী ঘটনা। হাসনাতের ভালো নাম মোহাম্মদ আবুল হাসনাত। আপনাদের বাড়ির কাছেই তার ক্যাবল কানেকশনের অফিস আছে— নাম 'হোম ভিডিও'। তার একটা ভিডিওর দোকানও আছে, সেটার নাম 'সানসাইন ভিডিও'। এটাও আপনাদের বাড়ির কাছে। অফিসে যেতে আসতে নিশ্চয়ই দেখেছেন। সঞ্জু প্রায়ই ভাড়া করে ভিডিওর দোকান থেকে ক্যাসেট আনত। সেই সূত্রে ভিডিওর দোকানের মালিকের সঙ্গে তার ভালো পরিচয়। হাসনাতকে সে ডাকত 'হাসনাত ভাই'। মাঝে মাঝে সে আর তার দুই বন্ধু মিলে হাসনাতের বাসায় আড্ডা দিত। মদ টদ খেত।

==========

কী খেত ?

মদ ফেনসিডিল এইসব খেত। ঘটনার দিন সকালবেলা সঞ্জু টেলিফোন করে হাসনাতকে দোকান থেকে বের করে নিয়ে এলো...

ফরহাদ উদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আরেকদিন শুনব। তাছাড়া আজ একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। যে ছেলেটার সঙ্গে সেতুর বিয়ে হচ্ছে তাকে নিয়ে আমরা বাইরে কোথাও খেতে যাব।

ইস্তিয়াক বলল, আমার তো মনে হয় আপনার এখনই শোনা উচিত। রিয়েলিটি ফেস করতে হবে। হবে না ?

হুঁ।

আপনার যে একজন মামা ছিলেন, ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ— সালু মামা। উনাকে অফিসে ডেকে এনেছিলাম— তিনি পুরো ঘটনা জানেন।

ও।

তাঁর সঙ্গে সব কথা হয়েছে। আমাদের প্ল্যান অব একশান কী হবে সেটাও আলাপ হয়েছে। প্রথম কথা, ছেলেকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। দ্বিতীয় কথা, জানাজানি করা যাবে না। আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে ?

হুঁ।

তাহলে থাক। আমাকে আবার একটু বেরুতে হবে। আপনি খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন না ? দুলি আপনার জন্যে বাইম মাছ আনিয়েছে। দুলি হাসনাতের পুরো ব্যাপারটা জানে। আপনি ওর কাছ থেকেও জেনে নিতে পারেন।

ফরহাদ উদ্দিন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। অদ্ভুত ঘটনা— ইস্তিয়াক কী বলছে এখন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। বিদেশী কোনো ভাষায় কথা বললে যেমন ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ মাঝে শোনা যায় সেরকম শোনা যাচ্ছে।

ইস্তিয়াক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো— তাঁর বুকের ওপর থেকে বড় একটা চাপ নেমে গেছে। এতক্ষণ কেউ একটা পাথর বসিয়ে রেখেছিল। ইস্তিয়াক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন পাথরটা সরাল। ফরহাদ উদ্দিন পা উঠিয়ে চেয়ারে বসে রইলেন। দুলি যখন এসে বলল, দুলাভাই খেতে আসুন— তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আজ রাত আটটায় তাঁর যে সবাইকে নিয়ে খেতে যাবার কথা তা আর মনে রইল না। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। ক্ষিধেয় পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে।

দুলি অনেক কিছু রান্না করেছে। কাঁঠালের বিচি দিয়ে শুটকি মাছ, বাইম মাছের ঝোল, চেপা ভর্তা, কুমড়া ফুলের বড়া। খেতে বসে ফরহাদ উদ্দিনের মন ভালো হয়ে গেল। কুমড়া ফুলের বড়া সেই কবে ছেলেবেলায় খেয়েছিলেন আর খাওয়া হয় নি। দুলি বলল, আজ সব স্পেশাল আইটেম রান্না হয়েছে। চিংড়ি মাছের একটা প্রিপারেশন আছে গরম ভেজে দিতে হয়। সব রেডি করে রেখেছি। আপনি খেতে বসলেই ভেজে নিয়ে আসব।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তুমি তো অনেক ঝামেলা করেছ।

দুলি বলল, যে খেতে ভালোবাসে তাকে খাওয়াতে ভালো লাগে। এ বাড়িতে কেউ খেতে পছন্দ করে না। ইস্তিয়াকের কাছে খাওয়াটা অত্যাচারের মতো। ডাল ভাত সে যেমন অনাগ্রহের সঙ্গে খাবে পোলাও কোরমাও সে-রকম অনাগ্রহের সঙ্গে খাবে। দুলাভাই আপনি খাওয়া শুরু করুন।

একা একা খাব?

বাসায় আর কেউ নেই যে আপনার সঙ্গে বসবে। আমি বসতে পারি। আমি বসলে মাছ ভেজে দেবে কে? আপনি সঞ্জুর ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আরাম করে খান।

ওর ব্যাপারে ভাবছি না।

সঞ্জুর মামা সব ব্যবস্থা করবে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। মকবুল সাহেবকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

মকবুল সাহেব কে?

ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। পুলিশ ইন্সপেক্টর।

ও আচ্ছা।

সেদিন বাসায় এসেছিলেন। আমিও কথা বলেছি।

ভালো করেছ।

এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে ভালো একটা মেয়ে দেখে সঞ্জুর বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। সংসারের জোয়াল কাঁধে পড়লে অন্য কোনো দিকে তাকাতে পারবে না। ওর নিজের কোনো পছন্দের মেয়ে যদি না থাকে আমাকে বলবেন। আমার হাতে ভালো ভালো কিছু মেয়ে আছে।

আচ্ছা।

খাওয়া শুরু করুন। প্রথম খান কুমড়া বড়া।

ফরহাদ উদ্দিন খেতে শুরু করলেন। যখন খেতে বসেছিলেন তখন মনে হয়েছিল ক্ষিধে নেই— এখন মনে হচ্ছে প্রচুর ক্ষুধা।

==========

ভালো রান্না বিরাট গুণ।

দুলি খুবই গুণী মেয়ে।

দুলাভাই, বড়া খেতে ভালো হয়েছে ?

খুব ভালো হয়েছে।

বড়া ভাজায় দশে আমাকে কত নম্বর দেবেন ?

দশে নয়।

এখন চেপা ভর্তা খান। চেপা ভর্তা যে ঠাণ্ডা ভাত দিয়ে খেতে হয় এটা জানেন ?

না।

চেপা ভর্তায় খুব ঝাল দেয়া হয় বলে গরম ভাত দিয়ে খাওয়া যায় না। ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত দিয়ে খেতে হয়। ঠাণ্ডা ভাত আমি আলাদা করে রেখেছি।

তুমি দেখি দারুণ একটা মেয়ে।

বাইম মাছের তরকারিটা এত ভালো হয়েছে যে খেয়ে ফেলতে পর্যন্ত মায়া লাগছে। দুলি বলল, আমি অনেকবার শুনেছি পারুল আপা আপনার কথা উঠলেই না-কি বলতেন, আপনার মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে জন্মায় না। আপনি এমন কী করতেন যে পারুল আপা এই ধরনের কথা বলত ?

ফরহাদ উদ্দিন লজ্জিত গলায় বললেন, আমি এমন কিছু করি নি।

শুধু শুধু তো একজনের সম্পর্কে এমন কথা বলা হয় না। নিশ্চয়ই কিছু করেছেন।

কিছু করলেও আমি জানি না। আমি বোকা মানুষ। বোকা মানুষ কোনো কাজ ভেবে চিন্তে করে না।

আপনি কি নিজেকে বোকা ভাবেন ?

ভাবাভাবির কিছু নাই। আমি বোকা।... আপনার বাইম মাছ রান্না অসাধারণ হয়েছে।

দুলি বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে হঠাৎ আপনি করে বলছেন কেন ?

ফরহাদ উদ্দিন লজ্জিত গলায় বললেন, ভুল হয়ে গেছে। আমার মাথাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সব কেমন আউলা ঝাউলা লাগে। কোনটা আমার বড় মেয়ে আর কোনটা মেজো ধরতে পারি না। ছোটজনকে নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। বড় দুজনকে নিয়ে খুবই ঝামেলা হয়। আপনাকে বলতে ভুলে গেছি আমার মেজো মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওর নাম মিতু না সেতু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

==========

ওদের নাম রাখার একটা ফর্মুলা বের করেছিলাম— MSN ফর্মুলা। এটাতেও ঝামেলা লেগে গেছে। MSN না-কি SMN নিয়ে গণ্ডগোল। আমার কথাবার্তা আপনি মনে হয় কিছু বুঝতে পারছেন না।

না।

বোঝার কথাও না। আজ খাওয়াটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে। হাঁসফাঁস লাগছে। আপনাদের ঘরে পান আছে ? পান থাকলে একটা পান খাব। না থাকলে অসুবিধা নেই, দোকান থেকে কিনে নেব।

ফরহাদ উদ্দিন খাওয়া বন্ধ করে হড়বড় করা কথা বলেই যাচ্ছেন। দুলি চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে।

খাওয়া বেশি হয়েছে তো এই জন্যে আজ অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে হবে। শরীরের ক্যালোরি হেঁটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এখান থেকে সরাসরি হেঁটে বাসায় যাব। এতেও কাজ হবে না। আরো হাঁটা দরকার।

দুলি বলল, আপনি হাত ধুয়ে ফেলুন। প্লেটের উপরই ধুয়ে ফেলুন। বেসিনে যাবার দরকার নেই। হাত ধুয়ে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন— আমি পান আনিয়ে দিচ্ছি। পানে কি আপনি জর্দা খান ?

না জর্দা খাই না। তবে আজ একটু খেয়ে দেখি। এক কাজ কর— পান যখন আনাচ্ছ সেই সঙ্গে একটা সিগারেটও আনাও। খেয়ে দেখি একটা সিগারেট। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় প্রতি মাসে হলে ফিস্ট হতো। ফিস্টের দিন আমি আর বদরুল একটা সিগারেট কিনতাম। ভাগাভাগি করে খেতাম। আমি তিন চারটা টান দিয়ে তাকে দিতাম, সেও কয়েকটা টান দিয়ে আমাকে দিত। ঐ সিগারেট টানাটানি থেকেই বদরুলের সিগারেটের নেশা ধরে গেল। আমার ধরল না।

আপনার জন্যে তো ভালোই।

বদরুলের মেয়েটা এখন আমার কাছে আছে। কনক নাম। অতি ভালো মেয়ে। দেখি একবার আপনার এখানে নিয়ে আসব।

বেশ তো নিয়ে আসবেন।

আমার মনে একটা গোপন ইচ্ছা আছে। সঞ্জুর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেয়া। হবে কি-না জানি না। বিয়ের ব্যাপারটা আল্লাহপাক ঠিক করে রাখেন। এখানে মানুষের কোনো হাত নেই।

দুলি বলল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ? কেমন করে যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন।

==========

ফরহাদ উদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। বেশি খেয়ে ফেলেছি এই জন্যে বোধহয়। বমি আসছে। আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে ?

তিনি বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারলেন না। তার আগেই ঘর ভাসিয়ে বমি করলেন। ফরহাদ উদ্দিনের দৃশ্যমান পৃথিবী দুলছে। ঘরটা ঘুরছে, দুলি ঘুরছে, খাবার টেবিল ঘুরছে। তিনি ঘূর্ণায়মান ঘরের দিকে একবার করে তাকাচ্ছেন আর বমি করছেন। তিনি কোথায় শুয়ে আছেন ? নিজের বাড়িতে ? না-কি এটা হাসপাতাল ? নিজের বাড়ির এক ধরনের গন্ধ থাকে। গায়ের ঘামের গন্ধের মতো আপন আপন গন্ধ। সেই গন্ধটা এখন পাচ্ছেন না। তাছাড়া চোখে আলো লাগছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে বাতি কখনো বন্ধ করা হয় না। সারারাত চোখে আলো লাগে। গলব্লাডার অপারেশনের সময় তিনি আটদিন হাসপাতালে ছিলেন। সেই স্মৃতি মনে আছে। ফরহাদ উদ্দিন পিটপিট করে চোখ মেলে আবারও বন্ধ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজন কপালে হাত রাখল। ফরহাদ উদ্দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এটা হাসপাতাল না। হাসপাতালে চোখ মেলা মাত্র কেউ কপালে হাত রাখে না।

রাহেলা বললেন, এখন কেমন লাগছে ?

ফরহাদ উদ্দিন নিচু গলায় বললেন, ভালো।

তোমাকে ওরা রাত এগারোটার সময় দিয়ে গেছে। এখন বাজে সাড়ে তিনটা। এতক্ষণ তুমি ঘুমাচ্ছিলে।

ও আচ্ছা।

আমি যে কী ভয় পেয়েছি একমাত্র আল্লাহপাক জানেন।

ঘরের আলোটা একটু নেভাও না। চোখে লাগছে।

রাহেলা বললেন, ঘরে বাতি জ্বলছে না তো। বারান্দায় বাতি।

ও আচ্ছা। আর মানুষজন কোথায় ?

সবাই জেগে আছে। আমি এ ঘরে আসতে নিষেধ করেছি। ডাক্তার বলে দিয়েছে কেউ যেন তোমাকে ডিসটার্ব না করে।

ও আচ্ছা।

এখন কি শরীরটা ভালো লাগছে ?

হুঁ।

কিছু খাবে ?

খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব।

==========

রাহেলা পানি আনার জন্যে উঠে গেলেন। দরজায় মিতু, সেতু, নীতু আর কনক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কেউ ঘরে ঢুকছে না। সেতু বলল, ভালো আছ বাবা ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ভালো আছিরে মা।

তুমি সবাইকে ভয় দেখাতে এত পছন্দ কর কেন বলো তো বাবা ? ভয়ে আমার সর্দি লেগে গেছে।

ফরহাদ উদ্দিন আনন্দে হেসে ফেললেন। এই মেয়েটা এত সুন্দর করে কথা বলে না হেসে পারা যায় না। ভয়ে আবার কারো সর্দি লাগে না-কি ?

রাহেলা পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকলেন। মেয়েরা দরজা থেকে সরে গেল। রাহেলা বললেন, চায়ের চামচ দিয়ে পানি মুখে দিয়ে দেব ?

ফরহাদ উদ্দিন উঠে বসতে বসতে বললেন, আরে না। আমি ভালো আছি। এখন শরীরটা ঝরঝরে লাগছে।

তিনি তৃপ্তি করে গ্লাসের পুরো পানি শেষ করলেন। রাহেলা বললেন, তুমি আজ যে আমাদের কী বিপদে ফেলেছ! আমরা সবাই সেজে গুজে বসে আছি। তোমার দেখা নেই। তুমি কোথায় গিয়েছ তাও জানি না। রাত নটা বেজে গেল। ঐ ছেলে রেস্টুরেন্টে একা বসে আছে। একটু পর পর সেখান থেকে টেলিফোন করছে। শেষে তোমাকে ছাড়াই চলে গেলাম।

খুব ভালো করেছ।

সেখানে গিয়ে আমি পড়লাম লজ্জায়। ঐ ছেলে কিছুতেই বিল দিতে দিবে না। সে যে শুধু খাবারের বিল দিল তা না প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা গিফট। আমার জন্যে শাড়ি, তোমার জন্যে পাঞ্জাবি। প্রত্যেক মেয়ের জন্যে একটা করে শাড়ি। কোনোটাই এলেবেলে না। দামি জিনিস। ছেলের খরচের হাত বেশ ভালো।

ফরহাদ উদ্দিন হাসলেন। রাহেলা বললেন, ছেলের এই দিকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। খরুচে ছেলে, কাউটা না।

কাউটা জিনিসটা কী ?

কাউটা হলো কৃপণ। মেয়েরা সবাই খুবই আনন্দ করেছে। আর সেতু কী করেছে এটা শোন— সে বলল, আপনি সবার জন্যে গিফট এনেছেন, আমার ভাইয়ার গিফট কোথায় ? ওর জন্যে গিফট আনেন নি সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি, এক কাজ করুন— ক্যাশ টাকা দিয়ে দিন, আমরা পছন্দ মতো কিনে নেব। আর আমাদের কাজের মেয়ে আছে, সে বাদ পড়বে কেন। বুঝে দেখ তোমার মেয়ের অবস্থা।

==========

ফরহাদ উদ্দিন হাসছেন। রাহেলা বললেন, হাসবে না। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তোমাকে দেখে সে-রকম মনে হচ্ছে না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুবই খুশি। খুবই আনন্দিত।

আনন্দিতই ছিলাম, বাসায় এসে দেখি তুমি বিছানায় আধমরা হয়ে পড়ে আছ। কাজের মেয়েটা বলল— একজন মহিলা এসে গাড়ি করে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। মহিলা বলে গেছেন তোমার শরীর সামান্য খারাপ। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তার তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। এবং বলেছেন যেন তোমাকে জাগানো না হয়।

ভদ্রমহিলা কে ? তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

ফরহাদ উদ্দিন জবাব দিলেন না।

রাহেলা বললেন তোমার কি ক্ষিধে পেয়েছে ? কিছু খাবে ? তোমার জন্যে খাবার রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে এসেছি।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, আমি কিছু খাব না।

রাহেলা বললেন, তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর একটু শীত শীত লাগছে। ফ্যানের স্পিড একটু কমিয়ে দিলে ভালো হতো। কিন্তু এই কথাটা রাহেলাকে বলতে ইচ্ছা করছে না। রাহেলা কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর খুবই ভালো লাগছে।

রাহেলা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে যাই— তোমার ঐ মামা, সালু মামা— কয়েকবার টেলিফোন করেছেন। তোমাকে তার না-কি বিশেষ দরকার। কী দরকার বলো তো ?

জানি না।

রাহেলা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার কাছে অনেক কিছু গোপন কর। এটা আমার ভালো লাগে না। কারো কাছে কোনো কিছু গোপন করার অর্থ তাকে অবিশ্বাস করা। দীর্ঘ দিন তোমার সঙ্গে জীবন যাপন করেও তোমার বিশ্বাস অর্জন করতে পারি নি— এটা খুবই দুঃখের কথা।

রাহেলা বললেন, আজ সন্ধ্যায় তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

ফরহাদ উদ্দিন জবাব দিলেন না। এরকম ভাব করলেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইচ্ছা করে নিঃশ্বাসের শব্দ ভারী করলেন। রাহেলার প্রশ্নের জবাব দিলে তাকে সত্যি কথা বলতে হবে। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত মিথ্যা বলা যাবে

==========

না। রাহেলাকে এই মুহূর্তে কোনো সত্যি কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ?

ফরহাদ উদ্দিন ঘুমের অভিনয়টা আরো ভালো করার চেষ্টা করলেন। গাঢ় ঘুমের সময় মানুষ নিঃশ্বাস দ্রুত ফেলে না ধীরে ধীরে ফেলে এটা মনে পড়ছে না। মনে পড়লে ভালো হতো।

==========

সালু মামা বললেন, ব্যাপার কী তুই তো বুড়ো হয়ে গেছিস! চুলটুল পাকিয়ে— গাল ভেঙ্গে কী অবস্থা। চাপার দাঁত পড়েছে ? চাপার দাঁত না পড়লে তো গাল ভাঙ্গার কথা না।

ফরহাদ উদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। সালু মামা তার থেকে খুব কম করে হলেও পনেরো বছরের বড়। তাঁকে মোটেও সে-রকম লাগছে না। সুন্দর করে আঁচড়ানো কুচকুচে কালো চুল। পরনে ঘি রঙের ফতুয়া। মুখভর্তি হাসি। এক একবার হাসছেন ধবধবে সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠছে। মানুষের এত সাদা দাঁত সচরাচর চোখে পড়ে না। ফরহাদ উদ্দিন মোটামুটি মুগ্ধ চোখে তার মামার দাঁতের দিকে তাকিয়ে আছেন। সালু মামা বললেন, কলপ দিস না কেন ? আমাকে দেখ, ইয়াং ভাব এখনো কিছুটা আছে না ?

হুঁ।

দাঁতগুলি নকল, কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই। মাসে দু'বার কলপ দেই। একবার ফ্যাসিয়েল করাই। ভালো একটা পার্লার আমার পরিচিত আছে, এরা খুবই যত্ন করে কাজটা করে। ফ্যাসিয়েল কখনো করিয়েছিস ?

জ্বি না।

এটা মুখের একটা ম্যাসেজ। ক্রিম টিম মাখিয়ে কিছুক্ষণ ডলাডলি করে। স্টিম দেয়। এতে মুখের চামড়া ভালো হয়। চামড়ায় যে দাগ পড়ে দাগগুলি উঠে যায়। বয়স কম লাগে। বুড়ো সেজে ঘুরে বেড়ানোর দরকার কী ? কোনো দরকার নেই। তোর অফিস ঘরে সিগারেট খাওয়া যায় তো ?

যায়।

বাঁচলাম। আজকাল বেশিরভাগ অফিসেই নো স্মোকিং করে দিয়েছে। অফিসে কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার জোগাড় হয়। একটা জিনিস এরা বোঝে না রাস্তায় এক ঘণ্টা গাড়ির ধোঁয়া খাওয়া দশ প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার সমান। ঠিক বলেছি না ?

জ্বি।

==========

সালু মামা ফতুয়ার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন— চা দিতে বল। আর দরজা টেনে দে। জরুরি কথাগুলি শেষ করি। এখানে কথা বলতে অসুবিধা আছে না-কি ক্যান্টিনে চলে যাব ?

এখানেই বলুন।

সালু মামা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন— ইস্তিয়াকের কাছে সঞ্জুর ঘটনা শুনে আমার কচ্ছপের মতো অবস্থা হয়েছিল। হাত পা সব দেখি শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। বলে কী! আমাদের সঞ্জু। দুধের শিশুর এ-কী কারবার!

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ঘটনা ঠিক না। সঞ্জু হাসনাত নামে কাউকে চিনে না।

চিনে না ?

জ্বি না। ওরা ভুল করেছে। নাম গুলিয়ে ফেলেছে।

সালু মামা চিন্তিত গলায় বললেন, পুলিশ এমন জিনিস যে, ওরা যদি শুদ্ধ করে তাহলেও বিপদ, যদি ভুল করে তাহলে আরো বড় বিপদ। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো বিপদ কাটিয়ে বের হতে হবে।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। সালু মামা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির শব্দ করলেন। ফরহাদ উদ্দিন মামার দিকে তাকিয়ে আছেন। মানুষটাকে দেখে তাঁর ভরসা লাগছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছুই হয় নি।

ফরহাদ!

জ্বি মামা।

তুই কোনোরকম চিন্তা করিস না। চিন্তা ভাবনার ব্যাপারটা তুই আমার হাতে ছেড়ে দে। সঞ্জু কী করেছে এটা কাক পক্ষীও টের পাবে না। আমরা পুরো ঘটনাই গিলে ফেলব।

ও কিছু করে নি মামা।

ফাইন। অতি উত্তম। না করলে তো ভালো। করবেই বা কেন ? ও ভদ্রলোকের ছেলে না ? যাই হোক পুলিশ যখন সন্দেহ করছে তাদের সন্দেহ দূর করতে হবে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সঙ্গে আমি অলরেডি কথা বলেছি। নম্র ভদ্র বিনয়ী। নাম মকবুল। মকবুল সাহেব বলেছেন— স্যারের আপন ভাগ্নে। স্যারের অতি প্রিয় বোনের একমাত্র ছেলে। বোন মারা গেছেন। ছেলেটাই শুধু আছে। সেটা আমি দেখব।

তবে ঐ লোক গভীর পানির মাছ। মাছ বলা ঠিক না, সে হলো মৎস্য। গভীর পানির মৎস্য— দশ হাজার ফুট নিচের পানির জিনিস।

==========

ও আচ্ছা!

হারামিটা এক ফাঁকে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে— টাকা পয়সা লাগবে। অনেকের মুখ বন্ধ করতে হবে। মামলা অন্যভাবে সাজাতে হবে তার খরচা। আমি এমন ভাব করেছি যে তার কথাবার্তা বুঝতে পারছি না। সঞ্জু এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছে এই দুঃখে আমি অস্থির এরকম একটা ভাব ধরলাম। ভালো করেছি না ?

জ্বি।

তুমি যদি হও গভীর জলের মাছ— আমি পাতালের মাছ। আমাদের সঙ্গে ইস্তিয়াক আছে। আসামির আপন মামা। নিজেদের মধ্যে পুলিশের বড় অফিসার থাকায় সুবিধা হয়েছে। না থাকলেও অসুবিধা হতো না। ফাঁক দিয়ে বের করে নিয়ে আসতাম।

সালু মামা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে গলা নিচু করে বললেন— টাকা খরচ করতে হবে। তোর টাকা পয়সার অবস্থা কী ? লাখ দু'এক টাকা এই মুহূর্তে লাগবে। এক কাজ কর টাকাটা ইস্তিয়াককে দিতে বল। ওরই তো ভাগ্নে। মাছের তেলে মাছ ভেজে ফেলি। তোর বলতে লজ্জা লাগলে আমি বলতে পারি। বলব ?

ফরহাদ উদ্দিন চুপ করে রইলেন। হঠাৎ করে তাঁর মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। সালু মামা কী বলছেন মাথায় পুরোপুরি ঢুকছে না।

সালু মামা গলা নামিয়ে বললেন, সঞ্জুর মা তার বাপের সম্পত্তির অংশও তো পাবে। টাকাটা সেখান থেকে দিক। তুই ঝিম মেরে আছিস কেন ? কিছু বল।

কী বলব ?

টাকা পয়সার ব্যাপারটা কী করা যায় সে সম্পর্কে কিছু বল। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনার মতো পড়ে থাকলে তো হবে না। একশানে যেতে হবে। সঞ্জু যে কোলকাতায় গিয়েছিল ফিরেছে ?

ফিরেছে।

কবে ফিরেছে ?

গতকাল সকালে।

থাকছে কোথায় ? তোর বাড়িতে ?

হ্যাঁ।

ওর তো তোর ওখানে থাকা ঠিক না। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যাবে— নানান যন্ত্রণা করবে। টাকা বের করার জন্যে নানান প্যাঁচ খেলতে থাকবে। সঞ্জুকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিবি। তা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার ক্লোজ সিটিং

==========

এরও দরকার আছে। প্ল্যান অব একশান ঠিক করতে হবে।

কী প্ল্যান অব একশান ?

আমি কয়েকটা প্ল্যান ঠিক করেছি। প্রত্যেকটা প্ল্যানের ভালোও আছে, মন্দও আছে। চিন্তা ভাবনা করে যে-কোনো একটা নিতে হবে। পুলিশ ফাইন্যাল রিপোর্টে তার নাম লেখবে না এটা ধরে নিলাম। ইস্তিয়াক আছে। আমরাও টাকা খাওয়াব। তারপরেও ব্যাক আপ সিস্টেম থাকা দরকার।

ব্যাক আপ সিস্টেম মানে ?

ধর লাস্ট মোমেন্টে কোনো একটা সমস্যা হলো— পুলিশ সঞ্জুর নাম বাদ দিল না। নাম ঢুকিয়ে দিল। তখন যাতে কেটে বের হয়ে যেতে পারি সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। তোর অফিসের চা-তো খুব ভালো। আরেক কাপ খাই— এখানে না, চল তোদের ক্যান্টিনে বসে খাই। আমি আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না। তোর ক্যান্টিনে নাস্তার ব্যবস্থা কী ? আলসার ধরা পড়েছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সলিড ফুড পেটে যাওয়া দরকার। আর শোন— তুই মুখ এমন ভোঁতা মেরে বসে আছিস কেন ? কন্ট্রোল পুলিশের হাতে না, আমার হাতে। নিশ্চিন্ত মনে থাক। টাকা পয়সা নিয়েও চিন্তা করবি না— জোগাড় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এদিকে আরেক কাজ করব— কোনো একটা মাদ্রাসার তালেবুল এলেমদের দিয়ে এক লাখ চল্লিশ হাজার বার খতমে ইউনুস পড়ায়ে ফেলব। আল্লাহও খুশি রইল।

ক্যান্টিনে ঢুকে সালু মামা দু'টা সিঙ্গাড়া এবং আলুর চপ খেলেন। চাইনিজ চিকেন কর্ন স্যুপ পাওয়া যাচ্ছে। এক বাটি পঁচিশ টাকা। স্যুপেরও অর্ডার দিলেন। ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে বললেন— তোর যে সত্যি কথা বলার একটা বাতিক উঠেছিল সেটা এখনো আছে ?

ফরহাদ উদ্দিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কত বছরের যেন তোর প্ল্যান ? কুড়ি না পঁচিশ ?

কুড়ি।

শেষ হবে কবে ?

ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরের তিন তারিখ।

তখন কী হবে ? তুই কি পীর দরবেশ কিছু হয়ে যাবি ?

না— তখন মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

সালু মামা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুই যে এত বোকা জানতাম না। ডিফ এন্ড ডাম অর্থাৎ বোবারা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে ? তারা সারা জীবনে

==========

মিথ্যা বলতে পারে না। কথাই বলতে পারে না, মিথ্যা বলবে কী ? তাদের কোন ইচ্ছাটা পূর্ণ হয় ? তুই যে শুধু বোকা তা না। মহাবোকা। এই জন্যে তোকে অত্যধিক স্নেহ করি। তোকে কতবার বলেছি কোনো সমস্যায় পড়লে আমার কাছে আসবি। নিজে নিজে সল্‌ভ করতে পারবি না। তোর সেই ক্ষমতা নেই। সব গুবলেট করে ফেলবি। আছে কোনো সমস্যা ?

না।

সমস্যা ছাড়া মানুষ আছে ? বন আছে পাখি নাই, মানুষ আছে সমস্যা নাই এটা কখনো হবে না। ভেবে টেবে দেখ।

একটা ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পারবে মামা ?

সালু মামা বিস্মিত হয়ে বললেন— কার ঠিকানা ?

কনক বলে একটা মেয়ে আমার এখানে থাকে, তার মা'র ঠিকানা। ভদ্রমহিলা কাউকে কিছু না বলে অস্ট্রেলিয়ায় ইমিগ্রেশন নিয়ে চলে গেছেন। অনেক চেষ্টা করে উনার অস্ট্রেলিয়ার ঠিকানা পাচ্ছি না।

তোর বন্ধু বদরুলের বউ-এর কথা বলছিস ?

তোমার মনে আছে ?

মনে থাকবে না কেন ? তার ঠিকানা বের করা কোনো ব্যাপারই না। অস্ট্রেলিয়ান এম্বেসির মাধ্যমে এগোতে হবে। সরাসরি এম্বেসির কাছে গেলে ওরা পাত্তা দিবে না। রেডক্রসের মিসিং পারসন ব্যুরোর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে। তুই একটা কাগজে ভদ্রমহিলার নাম লিখে দে। নাম, বাবার নাম, স্বামীর নাম— পাত্তা লাগিয়ে দেব। এটা কোনো মামলাই না। সাত ধারার মামলার মতো সহজ মামলা। কোর্টে উঠার আগেই খালাস।

স্যুপ এসে গেছে। সালু মামা গভীর আগ্রহে স্যুপ খাচ্ছেন। ফরহাদ উদ্দিনের কেমন জানি গা গুলাচ্ছে। বমি ভাব হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্যুপ থেকে কোনো বাজে গন্ধ ফরহাদ উদ্দিনের নাকে আসছে। কাঁচা মুরগির মাংসের গন্ধ। তার কি ঘ্রাণ শক্তি ফিরে আসছে ?

তুই এমন নাক কুচকাচ্ছিস কেন ?

শরীর খারাপ লাগছে।

এক বাটি স্যুপ খা। স্যুপটা এরা ভালো বানায়। দশে এদের আট সাড়ে আট দেয়া যায়। মাঝে মাঝে তোর অফিসে এসে স্যুপ খেয়ে যাব। গাদাখানিক সিঙ্গাড়া সমুচা খাওয়ার চেয়ে এক বাটি স্যুপ খাওয়া ভালো।

ফরহাদ উদ্দিন বমি আটকে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। সঞ্জু

==========

কোলকাতা থেকে ফেরার পর তার সঙ্গে যখন দেখা হলো তখনো ফরহাদ উদ্দিনের এমন হলো। সঞ্জুর গা থেকে কি কোনো গন্ধ আসছিল ? ভেজা কাপড় অনেকদিন ট্রাংকে রেখে দিলে ছাতা পড়ে এক ধরনের গন্ধ বের হয় সে-রকম কিছু ? যে গন্ধে বমি বমি ভাব হয়। কিন্তু বমি হয় না। খুবই অস্বস্তির ব্যাপার। সঞ্জুর সামনে তিনি বমি বমি ভাব নিয়ে বসে রইলেন। সঞ্জু বলল, বাবা তোমার জন্যে এক জোড়া স্যান্ডেল এনেছি। রাদুর স্যান্ডেল। সঞ্জু ব্যাগ থেকে স্যান্ডেল বের করে তাঁর সামনে রাখল। তখন তিনি বুঝলেন— এতক্ষণ তিনি যে গন্ধ পাচ্ছেন সেটা কাঁচা চামড়ার গন্ধ। সঞ্জুর সামনে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। সালু মামার সামনে বসে মনে হচ্ছে ঘ্রাণশক্তি সত্যি সত্যি ফিরে আসছে। তাঁর জীবনে খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। তিনি ঘ্রাণশক্তি ফিরে পাচ্ছেন। কাগজি লেবুর গন্ধ কেমন তিনি ভুলেই গেছেন! প্রথম যেদিন পাবেন সেদিন আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটবে। প্রথম হয়তো কিছুক্ষণ বুঝতেই পারবেন না গন্ধটা কিসের।

ফরহাদ, তুই ঝিম ধরে আছিস কেন ?

শরীরটা ভালো লাগছে না মামা।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নে। আমার সঙ্গে চল।

কোথায় যাব ?

ইন্টারেস্টিং কোনো জায়গায় নিয়ে যাই চল। বাসা-অফিস, অফিস-বাসা করে তো জীবনটাই শেষ করে দিলি। শরীরের আর দোষ কী ? শরীর আনন্দ চায়, উত্তেজনা চায়। মদ খেয়েছিস কখনো ?

জ্বি না।

কী আশ্চর্য কথা, একটা জীবন পার করে দিলি জিনিসটা চেখে না দেখেই ? সারা পৃথিবীর মানুষ এই জিনিস খাচ্ছে— মদের ব্যবসা হলো কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা। সেই জিনিস এক ঢোক খাবি না ? আমার সঙ্গে চল আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। গান বাজনা শুনবি। ইচ্ছা হলে এক আধটু বিয়ার টিয়ার খাবি। বিয়ার মদের মধ্যে পড়ে না। বিয়ার খেলে দোষ নেই। সঞ্জুর ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করার জন্যেও এটা করা দরকার। মাইন্ড রিলাক্সেসন।

মামা থাক।

আচ্ছা থাক। সঞ্জু যে কোলকাতা থেকে ফিরেছে তার আচার ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখেছিস ?

না।

==========

শক্ত ছেলে, ভেরি টাফ। গাইডেন্সের অভাবে পিছলে পড়ে গেছে। টেনে তুললেও লাভ হবে না, আবার পড়ে যাবে।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, মামা, ও হাসনাত নামের কাউকে চিনে না। আমি মিথ্যা কথা বলছি না মামা। তুমি তো জানো আমি মিথ্যা বলি না।

তুই অবশ্যই সত্যি কথা বলছিস। সত্য কথা বলার সাধনা করছিস, সত্যি কথা তো তোকে বলতেই হবে। তোর ছেলে তো আর সে-রকম কোনো সাধনা করছে না। ও মিথ্যা বলছে। মানুষ যে মারে তার কাছে মিথ্যা কিছু না।

ফরহাদ উদ্দিন আতঙ্কিত গলায় বললেন, তুমি কী বলছ মামা ? ও মানুষ কীভাবে মারবে ?

আচ্ছা যা মারে নাই। হাসনাতকে কোলে বসিয়ে গালে চুমু দিয়েছে। এটা ভেবে যদি মনে শান্তি পাস তাহলে তাই ভাব। মনে শান্তি পাওয়া দিয়ে কথা।

মামা এরকম করে কথা বলবে না। সঞ্জু তোমার ছেলে না। তুমি তাকে চিনবে না। আমার ছেলে আমি চিনি।

সালু মামা গম্ভীর গলায় বললেন, মানুষ নিজেকেই চিনে না সে তার ছেলেকে চিনবে কীভাবে ? রবী ঠাকুরের বিখ্যাত গান আছে না— 'চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' ভুল গান। গানটা হওয়া উচিত— চিনি না চিনি না তোমারে ওগো বিদেশিনী। ফরহাদ চল তোর ঘরে আবার যাই। কয়েকটা টেলিফোন করি। দেখি কনকের মা'র ঠিকানা বের করা যায় কি-না। সময় নষ্ট করা ঠিক না। টাইম ইজ মানি।

সালু মামা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, সঞ্জুর ওজন কি পাঁচ ছয় কেজি বেড়েছে। ওজন বাড়ার কথা।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, ওজন বাড়বে কেন ?

মানুষ খুন করার পর খুনির ওজন বাড়তে থাকে। আট দশ কেজি পর্যন্ত বাড়ে। পরীক্ষিত সত্য। কেন বাড়ে জানি না। ব্যাপারটা রহস্যময়।

সঞ্জুর গায়ে জ্বর। কোলকাতা থেকে সে ফিরেছে জ্বর নিয়ে। আজ সারা দিনই সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় পড়েছিল। এখন তার গায়ে ঘাম দিচ্ছে। জ্বর ছেড়ে যাবার লক্ষণ। গত দু'দিন সে কোনো সিগারেট খেতে পারে নি। তামাকের গন্ধেই শরীর উল্টে যেত। সিগারেট ধরানো দূরের কথা সিগারেটের কথা ভাবলেই মাথা ঘুরত। এখন সে-রকম হচ্ছে না। সঞ্জুর মনে হলো সে একটা সিগারেট ধরাতে পারে। তার জ্বরটা সেরেছে কি-না সে পরীক্ষাও হয়ে যাবে।

==========

সিগারেট অর্ধেকের মতো টানতে পারলেও বুঝতে হবে জ্বর কমে যাচ্ছে।

ঘরে কোনো সিগারেট নেই। টেবিলের ড্রয়ারে একটা রিজার্ভ প্যাকেট সব সময় থাকে। সেই প্যাকেটটাও নেই। কোলকাতায় যাবার সময় কি সে এই প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিল ? মনে পড়ছে না। সে সিগারেট কেনার জন্য ঘর থেকে বের হলো। লুঙ্গি পরে সে কখনো ঘর থেকে বের হয় না। আজ আর লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে ইচ্ছা করছে না। বাসার সামনেই দোকান। লুঙ্গি পরে যাওয়া যায়।

সঞ্জু দু'প্যাকেট সিগারেট কিনল। সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট হাতে নিল আর ঠিক তখনই অমায়িক চেহারার পাঞ্জাবি পরা লম্বা রোগা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলল— আপনি সঞ্জু না ?

সঞ্জু বলল, জ্বি।

ফরহাদ উদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে ?

সঞ্জু বলল, জ্বি।

ভালো আছেন ?

সঞ্জু বলল, আপনাকে চিনতে পারছি না।

আমার নাম মকবুল। মকবুল হোসেন। আমাকে চেনার কথা না। আমি একজন পুলিশ অফিসার। আপনাকে কষ্ট করে একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।

কোথায় ?

ডিবি অফিসে। দু'একটা রুটিন প্রশ্ন করব। পাঁচ-দশ মিনিটের ব্যাপার।

এখানে করুন।

একটু কষ্ট করতে হবে যে ভাইয়া। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, গাড়িতে উঠুন।

মকবুল হোসেন হাত বাড়িয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো পুলিশের জীপ দেখাল। সঞ্জু শান্ত গলায় বলল, এখনই আমি গাড়িতে উঠতে পারব না। আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা বাড়িতে জানিয়ে যেতে হবে। আমার পরনে লুঙ্গি। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে হবে।

মকবুল হোসেন হাসি হাসি মুখে বলল— লুঙ্গি তো খুব ভালো পোশাক। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সারা জীবন লুঙ্গি পরেছেন। লুঙ্গি পরে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন।

সঞ্জু কড়া গলায় বলল, আপনি সময় নষ্ট করছেন, আমি এভাবে যাব না।

সঞ্জুর কঠিন কথায় মকবুল হোসেনের মুখের হাসি নষ্ট হলো না। বরং তার

==========

মুখ আরো অমায়িক হয়ে গেল। সে এগিয়ে এসে সঞ্জুর কাঁধে হাত রেখে বলল— ভাইয়া গাড়িতে উঠতে হবে। এই মুহূর্তে। আমি হেংকি পেংকি পছন্দ করি না।

মোটামুটি অন্ধকার খুপড়ির মতো একটা ঘর। দিনের বেলাতেও সেই ঘরে বাতি জ্বলছে। তাতে অন্ধকার দূর হচ্ছে না— কারণ একমাত্র জানালাটাও বন্ধ। ঘরের আসবাব বলতে বড় একটা কাঠের টেবিল। টেবিলের দু'পাশে দু'টা হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ার। ঘরের দু'টা দেয়াল ভর্তি র‍্যাক। র‍্যাকে ফাইলপত্র। সব ফাইলের ওপর ধুলা জমে আছে। বোঝাই যাচ্ছে দীর্ঘদিন কেউ এইসব ফাইলে হাত দেয় না। মেঝেতে এক জোড়া ছেঁড়া গামবুট। এই ঘরেই কোথাও ইঁদুর-টিদুর মরে পচে আছে। বিকট দুর্গন্ধ আসছে। সঞ্জু পাঞ্জাবি দিয়ে নাক ধরে আছে। তার ঠিক সামনেই বসে আছে মকবুল হোসেন। সে নির্বিকার। মনে হচ্ছে পচা ইঁদুরের গন্ধে তার কিছু যাচ্ছে আসছে না। মকবুল হোসেনের সামনে এক কাপ চা। সে বেশ আয়েশ করেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে। সঞ্জু বলল, কী জিজ্ঞেস করতে চান তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করুন। আমি এই ঘরে থাকতে পারছি না।

মকবুল হোসেন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সঞ্জুর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, হাসনাতকে বাসা থেকে টেলিফোন করে কে এনেছে তুমি না— না-কি তোমার অন্য দুই বন্ধুর একজন ?

সঞ্জু বলল, হাসনাত নামে আমি কাউকে চিনি না।

মকবুল হোসেন বলল, ভাইয়া আমাকে রাগাবেন না। রেগে গেলে আমি খারাপ লোক হয়ে যাই। ড. জ্যাকেল মিস্টার হাইডের গল্প জানেন না ?

খারাপ লোক হন আর যাই হন আমি হাসনাতকে চিনি না।

চিনেন না ?

না।

মকবুল হোসেন চায়ে তৃপ্তির একটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোমার লুঙ্গির নিচে দু'টা বিচি আছে না ? ঐ বিচি দু'টা যখন টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব তখন সব চিনবে।

সঞ্জু হতভম্ব গলায় বলল, আপনি এইসব কী বলছেন ?

নোংরা কথা বলছি। তুমি মানুষ খুন করতে পারবে আর আমি দু'টা নোংরা কথা বলতে পারব না। তা তো না। গা থেকে পাঞ্জাবিটা খোল— আর লুঙ্গি খোল। লুঙ্গির নিচে আন্ডারওয়্যার আছে ? থাকলে সেটাও খোল। নাংগু বাবা হয়ে যাও।

==========

সঞ্জুর বুক ধ্বক করে উঠল। মকবুল হোসেনের গলার স্বর পাল্টে গেছে। কথা বলার ভঙ্গি পাল্টে গেছে। তবে মুখের অমায়িক ভাবটা এখনো আছে। সঞ্জুর এখন মনে হচ্ছে এই লোক করতে পারে না এমন কাজ নেই।

মকবুল হোসেন সিগারেট ধরাল। আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে ডাকল— ফতে মিয়া। ঐ ফতে।

হাফ প্যান্ট পরা খালি গায়ের একজন বেঁটে লোক ঢুকল। অত্যন্ত বলশালী লোক। কিন্তু গলার স্বর মেয়েলি। সে চিকন গলায় বলল, স্যাররে আরেক কাপ চা দিমু ?

মকবুল হোসেন বলল, দে।

লেম্বু চা না দুধ চা ?

দুধ চা। তোর লেম্বু চা মুখে দেওয়া যায় না। চা দেয়ার আগে একটা কাজ কর, চেয়ারে হারামিটা বসে আছে— তার কাপড় চোপড় খুলে তারে নেংটা কর। তারপর হাঁটু দিয়ে তার বিচিতে একটা বাড়ি দে। বেশি জোরে দিবি না, মরে যেতে পারে। দুই নম্বরীটা দে।

সঞ্জু তাকিয়ে আছে। বেঁটে লোকটা সত্যি তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই তো লুঙ্গিতে হাত দিল। সত্যি সত্যি লুঙ্গি খুলে ফেলছে না-কি ? কী হচ্ছে এসব ? সঞ্জু কিছু বলতে যাচ্ছিল— কথা গলায় আটকে গেল। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো দুই পায়ের ফাঁকে তরল আগুন ঢেলে দিয়েছে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে— আবার ফিরে আসছে আগের জায়গায়। আবার সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর পুড়ছে। শরীর জ্বলে যাচ্ছে।

সীমাহীন ব্যথা ঢেউ-এর মতো উঠা নামা করছে। সঞ্জু আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে চিৎকার দিল। সেই চিৎকারও গলায় আটকে গেল। তবে মিলিয়ে গেল না, মাথার ভেতর চিৎকারটা হতে থাকল। হতেই থাকল। সময় কি থেমে গেছে ? কতক্ষণ পার হয়েছে ? সে চেয়ারে এসে কখন বসেছে ?

সঞ্জু!

উঁ।

উঁ কীরে হারামজাদা! বল ইয়েস স্যার।

ইয়েস স্যার।

হাসনাতকে কে খবর দিয়ে এনেছে ?

আমি।

ঘটনাটা কী ছিল ?

==========

টগর বিদেশে যাবার একটা সুযোগ পেয়েছিল। দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকার দরকার। টাকাটা জোগাড় হচ্ছিল না। প্রথমে সে টাকাটা ধার হিসেবে চেয়েছিল। হাসনাত ভাই রাজিও হয়েছিলেন টাকাটা দিতে। হঠাৎ বললেন, না। টগর গেল রেগে। আমরা ভয় দেখিয়ে উনার কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম। উনি হঠাৎ এমন চিৎকার শুরু করলেন— দোতলার ভাড়াটে উপরে চলে আসল। তখন হাসনাত ভাই-এর মুখ চেপে ধরা হয়েছে যাতে শব্দ কেউ না শোনে।

এটা ঘটছে টগরের বাসায় ?

জ্বি না টগরের চাচার বাসায়। ঐ বাসাটা খালি— বাসা দেখা শোনার জন্য টগর সেখানে একা থাকত।

মুখ চেপে ধরার কারণে হাসনাত মারা গেল ? মুখ কী দিয়ে চেপে ধরেছিলে, বালিস দিয়ে ?

জ্বি।

তুমিই তো ধরেছ তাই না ?

জ্বি।

তারপর ডেডবডি সরালে কীভাবে ?

টেলিভিশন যে কার্টুনে থাকে সে রকম একটা বড় কার্টুন বাসায় ছিল। সেই কার্টুনে ভরে— বেবিট্যাক্সি করে নিয়ে গেছে।

বেবিট্যাক্সি করে জসিম একা ডেডবডি নিয়ে গেছে ?

জ্বি একা নিয়ে গেছে।

মানুষ খুন করতে কেমন লাগল ?

সঞ্জু চুপ করে আছে। মকবুল হোসেন বলল— তোমাকে যে ছোট্ট চিকিৎসাটা এখানে করলাম বিচি চিকিৎসা। এই চিকিসার কথা মনে রাখবে। চিকিৎসাটা করেছি ইস্তিয়াক স্যারের নির্দেশে। তুমি তেরিবেরি করছিলে তো— এই তেরিবেরি বন্ধ করার জন্য। স্যার খবর দিলে যাও না, হাসনাত নামের কাউকে চেনো না— এইগুলি যেন পুরোপুরি বন্ধ হয়। বুঝতে পারছ ?

জ্বি।

তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তিনজনে মিলে কাজটা করেছ। সেই তিনজনের ভেতর কেউ যদি ধরা পড়ে তাহলে সে বাকি দুজনকে ফাঁসাবে। তিনজনের একজনকে বাদ দেয়া যায় না। বাদ দিলে তিনজনকেই বাদ দিতে হয়। তখন অন্য কাউকে ফাঁসাতে হয়। বুঝতে পারছ ?

==========

জ্বি।

বিচির ব্যথা কমেছে ?

জ্বি না।

এই ব্যথা এক মাস থাকবে। চা খাবে ?

জ্বি না।

ফতে মকবুল হোসেনের জন্য চা নিয়ে এসেছে। মকবুল হোসেন ফতের হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে বলল— ফতে তোর আগের বাড়িটা দুই নম্বরী দিতে বলেছিলাম— তা তো দিস নাই। তিন নম্বরী বাড়ি দিয়েছিস। এর ব্যথা কমে গেছে। দেখ না কেমন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

স্যার দুই নম্বুরী একটা দিব ?

দে।

সঞ্জু বিড় বিড় করে কী যেন বলল। কিছুই বোঝা গেল না। মকবুল হোসেন সঞ্জুর দিকে ঝুঁকে এসে বলল— এখন তোমাকে দুই নম্বরী বাড়ি দেওয়া হবে। কিছুক্ষণ জ্ঞান থাকবে না। বুঝতে পারছ ? দুই বিচির জন্যে দুটা ঠিক আছে না ?

জ্বি।

জ্ঞান ফেরার পর পাঞ্জাবি লুঙ্গি পরে নিও। তোমার মামা আমাদের স্যার ইস্তিয়াক সাহেব এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। উনাকে খবর দেয়া হয়েছে। ঠিক আছে ?

জ্বি।

আমাদের দু'জনের মধ্যে সামান্য যে খেলাধুলা হলো এটা কাউকে বলার দরকার নাই।

জ্বি।

তাহলে দুই নম্বর বাড়ির জন্য তৈরি হও। দুই নম্বর বাড়িটা না খেলে ঘটনা বুঝতে পারবে না।

সঞ্জু গোঙাতে গোঙাতে বলল, স্যার একটু আস্তে বাড়ি দিতে বলেন।

সঞ্জু পুলিশের জিপে বসে আছে। সঞ্জুর পাশে তার মামা ইস্তিয়াক। দু'জনের কেউ কোনো কথা বলছে না। ইস্তিয়াক মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে সঞ্জুকে দেখছে। যতবার সে তাকাচ্ছে ততবারই তার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। সঞ্জু এক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ডিবি অফিস থেকে বের হয়ে সে বেশ

==========

অবাক হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল বাইরে এসে দেখবে রাত— রাস্তার হলুদ বাতি জ্বলছে। অথচ বাইরে ঝকঝকে রোদ। সূর্যটা কোথায় দেখা যাচ্ছে না। সূর্য দেখা গেলে সময়ের আন্দাজ করা যেত। সঞ্জুর হাতে ঘড়ি নেই। তার মামার হাতে ঘড়ি আছে। আড়চোখে একবার তাকালেই সময় জানা যায়। আড় চোখে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। গাড়ি কোথায় যাচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি বনানী পার হয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে। সঞ্জুদের বাসা বা তার মামার বাসা কোনোটাই এদিকে নয়।

সঞ্জু !

জ্বি।

আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলো।

সঞ্জু মামার দিকে তাকাল।

একজন ক্রিমিন্যালকে পাশে বসিয়ে আমি যাচ্ছি এবং ক্রিমিন্যালের সঙ্গে কথা বলছি তার কারণ জানো ?

সঞ্জু জবাব দিল না। তার কপালের দু'টা রগ ফুলে উঠল। ইস্তিয়াক বলল, কপালের রগ ফুলিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। রগ ঠিক কর।

সঞ্জু মামার হাতের ঘড়িতে সময় দেখে নিয়েছে। একটা দশ। এখন মধ্য দুপুর। ইস্তিয়াক বলল, তোমার মা কেমন ছিলেন সেটা তুমি জানো না কারণ তাকে তুমি দেখার সুযোগ পাও নি। তোমার বাবাকে তুমি দেখেছ। তিনি কেমন মানুষ তুমি কি জানো ?

ভালো মানুষ।

ভালো মানুষের ডেফিনেশন কী ? একেকজনের কাছে ভালো মানুষের ডেফিনেশন একেক রকম। একজন ক্রিমিন্যালের কাছে ভালো মানুষের সংজ্ঞা এক রকম, একজন সাধুর কাছে অন্যরকম। আমি তোমার ডেফিনেশনটা শুনতে চাই।

মামা, আমার শরীর ভালো না। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

অন্যের কথা শুনতে কি ইচ্ছা করছে ? নাকি অন্যের কথা শুনতেও ইচ্ছা করছে না।

আপনি কী বলবেন বলুন।

তোমার বাবা একজন ভালো মানুষ। তাঁর ভালো মানুষী কোন পর্যায়ের সেই সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই বলে আমি মনে করি। ধারণা আছে ?

না।

তোমার মার মৃত্যুর পর তোমার বাবা আবার বিবাহ করেন। তখন আমাদের খুবই দুর্দিন। আমরা দুই ভাই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। টাকা পয়সার ভয়ঙ্কর টানাটানি। তোমার বাবা আমাদের দুই ভাইয়ের ইউনিভার্সিটির পড়ার খরচ শেষ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। এটা জানতে ?

না।

আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচে' ছোটজনের নাম আলতাফ। তোমার বাবা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ও আম খেতে খুব পছন্দ করত। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। কোনো কিছুই খেতে পারত না। যেদিন মারা যাবে সেদিন তাকে আম কেটে দেয়া হয়েছে। দেখা গেল খুব আগ্রহ নিয়ে আম খাচ্ছে। আমগুলি তোমার বাবা নিয়ে এসেছিলেন। আম খেতে খেতে সে তোমার বাবাকে বলল— দুলাভাই, আমি মরে যাচ্ছি এটা জানি। মরে যাবার পর আম খেতে পারব না এটা ভেবে খারাপ লাগছে। তার মৃত্যুর পর একজন মানুষ আম খাওয়া ছেড়ে দিল, সে হলো তোমার বাবা। আমরা কেউ কিন্তু আম খাওয়া ছাড়লাম না। তোমার বাবা যে আম খান না এটা কি তুমি জানো ?

জানি।

কেন খান না জানো ?

এখন জানলাম।

আরো শুনবে ?

না।

আমি খুবই একটা অন্যায় করেছি। তুমি যে ক্রাইমটা করেছ সেটা তাঁকে বলে তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি। পৃথিবীর সব মানুষকে আমি কষ্ট দিতে পারি, তাঁকে কষ্ট দিতে পারি না। আমি তাঁর মনের কষ্টটা দূর করতে চাই।

কীভাবে ?

আমি তাঁকে বলব পুলিশ আসলে একটা ভুল করেছে। সঞ্জু এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত না। তুমিও তোমার বাবাকে এই মিথ্যাটা বলবে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার— যে মানুষটার জীবনের ব্রত সত্যি কথা বলা, তাকে পরামর্শ করে মিথ্যা কথা শুনতে হচ্ছে। চারদিক থেকে সে শুনবে মিথ্যা কথা, কিন্তু তাঁকে বলতে হবে সত্যি কথা।

গাড়ি উত্তরা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। ইস্তিয়াক ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

==========

সন্ধ্যাবেলা ফরহাদ উদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিলেন। ফুলওয়ালী মেয়েগুলো বেলি ফুল বিক্রি করছে। ফরহাদ উদ্দিনের কাছে ভাংতি ছিল না। তিনি দশ টাকা দিয়ে পাঁচটা মালা কিনলেন। ফুলগুলো নাকের কাছে ধরতেই হালকা গন্ধ পেলেন। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। তাঁর কি ঘ্রাণ শক্তি ফিরে আসছে ? কুড়ি বছর পূর্ণ হতে বেশি বাকি নেই, এই জন্য কি কিছু কিছু ইচ্ছা পূর্ণ হতে শুরু করেছে ? ফরহাদ উদ্দিন আরেকটা দশ টাকার নোট বের করে আরো পাঁচটা মালা কিনলেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। আশ্চর্য ঘটনা। ফুলের মালাগুলো দ্বিতীয়বার নাকের কাছে ধরলেন। কোনো গন্ধ পাওয়া গেল না। একটু আগে যে সুঘ্রাণ পেয়েছিলেন এটা কি মনের ভুল ? মনের ভুল হবার তো কথা না।

আশেপাশে কোথাও কি কোনো ডাস্টবিন আছে ? যার পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকজন নাক চেপে যায় ? ফুলের তীব্র গন্ধ না পেলেও ডাস্টবিনের তীব্র পূতিগন্ধ নাকে আসার কথা। ফরহাদ উদ্দিন ডাস্টবিন খুঁজতে লাগলেন। ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবেন। নাকে কোনো গন্ধ আসে কিনা পরীক্ষা হয়ে যাবে। এই পরীক্ষা জটিল পরীক্ষা— এসিড টেস্ট। যখন যা খোঁজা যায় তখন সেটা পাওয়া যায় না। ফরহাদ উদ্দিন হেঁটে যাচ্ছেন কিন্তু চোখে কোনো ডাস্টবিন পড়ছে না। বেছে বেছে কি আজই ঢাকা শহর আবর্জনা মুক্ত হয়ে গেল ?

তাঁর বাসার কাছেই ময়লা ফেলার জায়গা একটা আছে। সানসাইন ভিডিওর দোকানটার বামে। লোকজন নাকে রুমাল না দিয়ে ঐ জায়গাটা পারই হতে পারে না। ফরহাদউদ্দিন ঠিক করলেন আজ তিনি সানসাইন ভিডিওর দোকানের আশেপাশে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করবেন। ইস্তিয়াক বলেছিল হাসনাত নামের মানুষটা ছিল সানসাইন ভিডিওর মালিক। দোকানটার দিকে তিনি লক্ষ রাখছেন। কিছুদিন বন্ধ ছিল, এখন খুলেছে। লোকজন ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে ঢুকছে, বের হচ্ছে। মালিকের মৃত্যুতে ব্যবসা বন্ধ হয় নি। ব্যবসা চলছে। এমনকি হতে পারে দোকানের লোকজন তাদের মৃত মালিকের ছবি দোকানে টানিয়ে রেখেছে। তাহলে হাসনাত নামের লোকটা দেখতে কেমন ছিল জানা যেত।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মৃত মালিকের ছবি টানিয়ে রাখার রেয়াজ নেই, এতে ব্যবসা কমে যায়; তারপরেও ফরহাদ উদ্দিন কিছু কিছু জায়গায় এরকম দেখেছেন। শাপলা টেইলারিং হাউসে স্যুট টাই সানগ্লাস পরা একটা ছবি আছে।

==========

ছবির নিচে লেখা—

শাপলা টেইলারিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা
মাস্টার টেইলার আজিজ মিয়া
মৃত্যু ৭ই আগস্ট ১৯৮২

সানসাইন ভিডিওর দোকানটা তালাবদ্ধ। হাসনাত সাহেবের লোকজন ব্যবসা ঠিকমত দেখছে না। ভিডিও ব্যবসার আসল সময় হচ্ছে সন্ধ্যা। এই সময়ে দোকানে তালা দিয়ে চলে গেলে কীভাবে হবে।

ফরহাদ উদ্দিন ডাস্টবিনের দু'দিক দিয়ে দু'বার গেলেন। কোনো গন্ধ পেলেন না। তারপর একটু হেঁটে সানসাইন ভিডিওর বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। অফিস থেকে হেঁটে এই পর্যন্ত এসেছেন। খুবই ক্লান্তি লাগছে। এটা যদি ভিডিওর দোকান না হয়ে চায়ের দোকান হতো তিনি এক কাপ চা খেয়ে যেতেন। বাড়িতে চা খাওয়ার একরকম মজা আবার চায়ের দোকানে বসে চা খাওয়ার অন্য রকম মজা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ যে মেঘলা হয়ে ছিল এতক্ষণ খেয়াল হয় নি। শহরবাসীরা আকাশের দিকে তাকায় না। ফরহাদ উদ্দিন বুঝতেও পারেন নি আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মাখতে মাখতে তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন। তিনি এগুচ্ছেন অনাগ্রহের সঙ্গে। বাসায় ফিরতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। যদিও খুব ক্লান্ত লাগছে তবু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শহরে ঘুরতে ইচ্ছা করছে। বদরুলের পাল্লায় পড়ে এক ভাদ্রমাসে এ রকম কাণ্ড করেছিলেন। তাঁরা দু'জনই তখন কিশোরগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছেন। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে পান মুখে দিয়েছেন, হঠাৎ টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। বদরুল বলল, এই আয় বৃষ্টিতে ভিজি।

ফরহাদ উদ্দিন খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, এখন বৃষ্টিতে ভিজব কেন ?

বদরুল বলল, বৃষ্টিতে ভেজার কোনো সময় আছে নাকি ? বৃষ্টিতে যখন তখন ভেজা যায়। ভাদ্রমাসের বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না— আয় তো নামি।

বদরুলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি কঠিন কর্ম। তাঁকে বৃষ্টিতে নামতেই হলো। বদরুল বলল, আয় একটা প্রতিজ্ঞা করি— বৃষ্টি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমরা গায়ে বৃষ্টি মাখব। পাঁচ মিনিট থাকলে পাঁচ মিনিট। একঘণ্টা থাকলে এক ঘণ্টা। তাঁকে প্রতিজ্ঞাও করতে হলো। সেই বৃষ্টি আর থামেই না। সন্ধ্যার পর থেকে আকাশে মেঘের ওপর মেঘ জমতে শুরু করল। ঝড়ো বাতাস বইতে লাগল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। যে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন তারা

==========

অস্থির হয়ে গেল— মুরুব্বি শ্রেণীর একজন ছাতা হাতে বের হয়ে এসে বললেন— এ-কী পাগলামি করছেন ? অসুখে পড়বেন তো।

ততক্ষণে ফরহাদ উদ্দিনের কেমন রোখ চেপে গেছে— শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখা যাক। কিশোরগঞ্জের যে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই বাড়ির বড় মেয়ের সঙ্গেই বদরুলের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আসরে রব উঠেছিল— জামাই পাগল। পাগলের সঙ্গে বিবাহ মুসলিম আইনে সিদ্ধ না। তাতে সমস্যা হয় নি।

ফরহাদ উদ্দিন ঠিক করে রেখেছেন যদি সত্যি সত্যি কোনো একদিন বদরুল ফিরে আসে তাহলে পুরনো দিনের মতো বৃষ্টিতে ভেজার ব্যবস্থা করা হবে। এখন তো আর যৌবনকাল নেই— জ্বর জ্বারি হবে। হলে হবে।

অনেকক্ষণ কলিংবেল টেপার পর রাহেলা এসে দরজা খুলে দিলেন। ফরহাদ উদ্দিন বললেন, বাসায় কেউ নেই ?

রাহেলা খুশি খুশি গলায় বললেন, ঐ ছেলে এসে সব মেয়েদের নাটক দেখাতে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমাকে এসে বলল, আম্মা আপনিও চলেন। আমি লজ্জায় বাঁচি না।

লজ্জার কী আছে ?

বিয়ে হয় নি এখনি মা ডাকছে— লজ্জা লাগবে না ? এমনভাবে ধরেছিল একবার ভাবলাম চলেই যাই। কোনোদিন মঞ্চ নাটক দেখি নি।

গেলেই পারতে।

তুমি অফিস থেকে এসে দেখবে বাসায় কেউ নেই। আচ্ছা তোমার গা থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে কীসের ?

বেলি ফুলের।

ফরহাদ উদ্দিন পকেট থেকে বেলি ফুল বের করলেন। রাহেলার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদী ধরনের হয়ে গেল। গলার স্বরও ভারী হয়ে গেল। তিনি আদুরে গলায় বললেন, সেই কবে তোমাকে বেলি ফুল আনতে বলেছিলাম এতদিন পরে মনে পড়ল। তবে আজকে এনে ভালোই করছে। মেয়েরা কেউ বাসায় নেই। খোপায় বেলি ফুলের মালা দিয়ে রাখলে ওরা হাসাহাসি করতে পারবে না। কাঁচা দুধে বেলি ফুল চুবিয়ে রাখলে ফুলের গন্ধ দুধে চলে যায় এটা জানো ?

না।

ঐ দুধ দিয়ে পায়েস রাঁধলে পায়েসে বেলি ফুলের গন্ধ হয়। তোমাকে একদিন বেলি-পায়েস খাওয়াব।

আচ্ছা।

==========

আমি ভেবেছিলাম তোমাকে যে বেলি ফুল আনতে বলেছিলাম তুমি ভুলেই গেছ। আমার কোনো কিছু তো তোমার মনে থাকে না। আমি তো আর তোমার প্রথম স্ত্রীর মতো রূপবতীও না। গায়ের রঙ কালো।

ফরহাদ উদ্দিন লক্ষ করলেন রাহেলার চোখে পানি এসে গেছে। তিনি খুবই অবাক হলেন সামান্য কয়েকটা বেলি ফুল পেয়ে কেউ এত খুশি হতে পারে ? তিনি যে রাহেলার কথা মনে করে বেলি ফুল কিনেছেন তাও না। ফরহাদ উদ্দিনের লজ্জা লাগছে। এই সত্যি কথাটা তো গোপন রাখা ঠিক হচ্ছে না। রাহেলার তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা হচ্ছে। ফরহাদ উদ্দিন বিব্রত গলায় বললেন, রাহেলা কিছু মনে করো না। বেলি ফুলগুলি তোমার কথা মনে করে কিনি নি। তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছ। ভাবছ আমি সব মনে করে রাখি। এটা ঠিক না।

রাহেলা বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটু সঞ্জুর ঘরে যাও তো। ওর মনে হয় শরীর খারাপ। সকালবেলা লুঙ্গি পরে বাসা থেকে বের হয়েছে সারাদিন ফিরে নি। তুমি আসার ঘণ্টা দু'এক আগে ফিরেছে। বাতি জ্বালায় নি। চা-নাশতা কিছুই খায় নি। যে রকম দিয়েছিলাম সে রকম পড়ে আছে।

ফরহাদ উদ্দিন দ্রুত ছেলের ঘরের দিকে গেলেন। সঞ্জু সরলরেখার মতো খাটে শুয়ে আছে। তার গায়ে চাদর। সঞ্জু থমথমে গলায় বলল, বাবা বাতি জ্বালিও না।

ফরহাদ উদ্দিন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে ? জ্বর না-কি ?

জানি না। কপালে হাত দিও না।

কপালে হাত না দিলে বুঝব কি করে জ্বর কি-না।

বোঝার দরকার নেই।

জ্বর বেশি হলে ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার, মাথায় পানি ঢালা দরকার।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা। ব্যস্ত হবার মতো কিছু হয় নি।

সঞ্জুর ঘরে বাতি নেই, কিন্তু বারান্দার আলো এসে ঘরে পড়েছে। সে আলোতে দেখা যাচ্ছে সঞ্জুর মুখ রক্তশূন্য। ঠোঁট ফ্যাকাশে। চোখের নিচে মনে হয় কালি পড়েছে। ফরহাদ উদ্দিন বললেন— একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি ?

না।

এরকম করছিস কেন রে ব্যাটা ? আমি তো তোর খুব কাছের একজন

==========

মানুষ— দূরের তো কেউ না।

সঞ্জু চাপা গলায় বলল, বাবা আমার খুব মাথা ধরেছে। আমাকে একা একা চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও— মাথার যন্ত্রণাটা কমুক।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেই ? মাথা ধরা আরাম হবে।

না। বাবা তুমি আমার সামনে বসে থেকো না তো।

ফরহাদ উদ্দিন উঠলেন না। বসে রইলেন। তাঁর কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে তাঁর ছেলে এত বড় হয়েছে। লম্বা করে শুয়েছে— খাটের একেবারে এ মাথা ওমাথা। অথচ সেদিনই তো ছোট্ট ছিল। রাহেলাকে যখন বিয়ে করেন তখন সঞ্জুর বয়স ছ বছর। তিনি আর রাহেলা থাকেন এক ঘরে, সঞ্জু থাকে পাশের ঘরে। মাঝখানের দরজাটা খোলা থাকে। যেন ছেলে রাতে ঘুম ভেঙ্গে ভয় না পায়। প্রায় রাতেই বুকে একটা চাপ ব্যথা নিয়ে ফরহাদ উদ্দিনের ঘুম ভেঙ্গে যেত। বুকে চাপ ব্যথার কারণ হচ্ছে সঞ্জু পাশের ঘর থেকে চলে এসেছে। সে তার অভ্যাস মতো গলা জড়িয়ে বাবার বুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

ফরহাদ উদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে রওনা হলেন। তখন তাঁকে বিস্মিত করে সঞ্জু ডাকল— বাবা, একটা কথা শুনে যাও। ফরহাদ উদ্দিন আবারো এসে চেয়ারে বসলেন। সঞ্জু বলল— বাবা তুমি মনে কষ্ট পাচ্ছ কেন ? আমার যে কাজটার জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ সেই কাজটা আমি করি নি। আজ হোক কাল হোক পুলিশ ভুল স্বীকার করবে। এখন আমার কথা কি তোমার কাছে যথেষ্ট না ?

ফরহাদ উদ্দিন গাঢ় স্বরে বললেন, যথেষ্ট।

সঞ্জু বলল, এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে ঘুমাও। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখতে চাচ্ছিলে— জ্বর দেখ।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলের কপালে হাত রাখলেন। সঞ্জুর গায়ে জ্বর। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে ছেলেটা শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। মায়ায় ফরহাদ উদ্দিনের মনটা ভরে গেল।

==========

ফরহাদ উদ্দিনের অফিস ক্যান্টিনে সালু মামা বসে আছেন।

আজ তাঁকে খুব বিরক্ত মনে হচ্ছে। ক্যান্টিনে চিকেন কর্ন স্যুপের অর্ডার দিয়েছিলেন। স্যুপ আজ তৈরি হয় নি। সপ্তাহের সব দিন না-কি হয় না। রবিবার এবং বৃহস্পতিবার এই দু'দিন হয়। এ ধরনের কথা শুনলে মেজাজ খারাপ হবার কথা। সালু মামা থমথমে গলায় বললেন, তোদের ক্যান্টিন ম্যানেজারকে তো চাবকানো উচিত। সপ্তাহে দু'দিন স্যুপ হবে এটা কোন নিয়মে ? এই দু'দিন ছাড়া স্যুপ খাওয়া নিষেধ এরকম আইন কি জাতীয় পরিষদে পাশ হয়েছে ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, মামা অন্য কিছু খান।

আমি কিছু খাই বা না খাই সেটা অন্য ব্যাপার। সপ্তাহে দু'দিন স্যুপ কোন আইনে হবে এটা আমাকে বুঝিয়ে বল। এই দু'দিনের বিশেষত্ব কী ?

ভেজিটেবল প্যাকোরা দিতে বলি মামা ?

আরে না।

সালু মামা সিগারেট ধরালেন। ফরহাদ উদ্দিন মামার মেজাজ ঠিক হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মামার কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর খুবই মজা লাগছে।

ফরহাদ!

জ্বি।

এই কাগজটা রেখে দে, পরে দিতে ভুলে যাব।

কীসের কাগজ ?

কনকের মা'র ঠিকানা চেয়েছিলি— ঠিকানা লেখা আছে। সিডনিতে থাকে, ব্লাকটাউন সিডনি।

ফরহাদ উদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, সত্যি জোগাড় করে ফেলেছ ?

ভাগ্নের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সালু মামার বিরক্ত ভাবটা অনেকখানি কাটল। তিনি হাসি মুখে বললেন, তোকে কী বলেছিলাম, ঠিকানা জোগাড় করা

==========

আমার কাছে সাত ধারার মামলা। কোর্টে নেবার আগেই খালাস।

ঠিকানা যে তুমি সত্যি যোগাড় করে ফেলবে আমি ভাবি নি। মামা, তুমি চিকেন কাটলেট একটা খেয়ে দেখ। এরা চিকেন কাটলেট ভালো বানায়।

দিতে বল। আর ভেজিটেবল প্যাকোরা না কী যেন বললি ঐটাও এক প্লেট অর্ডার দে।

সালু মামা হাতের সিগারেট ফেলে ফরহাদ উদ্দিনের দিকে ঝুঁকে এলেন। গলা নামিয়ে বললেন— সঞ্জুর ব্যাপারটাও এখন আমি সাত ধারার মামলা বানিয়ে ফেলেছি। পুলিশ ফাইনাল রিপোর্টে সঞ্জুর নাম দিলেও কিছু করতে পারবে না। মন দিয়ে শোন কী করেছি— ঘটনাটা ঘটেছে আটই জুলাই।

কোন ঘটনা ?

সঞ্জু টেলিফোনে সানসাইন ভিডিওর মালিক হাসনাতকে ঐ দিন বাড়ি থেকে বের করে নিল।

ফরহাদ উদ্দিন হাসিমুখে বললেন, সঞ্জু ঐ ঘটনার সঙ্গে নেই। এটা সঞ্জু বলেছে। ইস্তিয়াকের সঙ্গে কথা হয়েছে। সেও বলেছে পুলিশ ভুল করেছে।

সালু মামা অবাক হয়ে বললেন, ইস্তিয়াক এই কথা বলেছে ?

হ্যাঁ বলেছে। তবে এটাও বলেছে যে পুলিশ ভুল করলেও আমাদের কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে হবে। কারণ পুলিশ সহজে ভুল স্বীকার করবে না। তোমার পরিকল্পনা মতো কাজ করতে বলেছে। তোমার পরিকল্পনাটা কী ?

সেটাই তো বলার চেষ্টা করছি। তুই তো কথাই শুনছিস না। মুখ ভর্তি হাসি। হাসির এখনো কিছু হয় নি।

তুমি বলো আমি শুনছি।

যেদিন হাসনাতকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়, ঐদিন অর্থাৎ আটই জুলাই ছিল সঞ্জুর বিয়ের দিন। ঐ দিন তার বিয়ে হয়। মিরপুরের উৎসব কমিউনিটি সেন্টারে।

মামা, আটই জুলাই তো পার হয়ে গেছে। ঐ দিন তো সঞ্জুর বিয়ে হয় নি। ও চাঁদপুরে না কোথায় যেন তার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

কথার মাঝখানে এত কথা বললে বুঝবি কী করে ? শুনে যা, পরে ব্যাখ্যা করব। আটই জুলাই ছিল সঞ্জুর বিয়ে। ঐ রাতেই তুর্না নিশিথিনী এক্সপ্রেসে করে স্বামী স্ত্রী দুজন চলে যায় চিটাগাং। সেখান থেকে যায় কক্সবাজার। তারা দু'রাত ছিল কক্সবাজারে। সমস্ত ডকুমেন্টস থাকবে আমাদের হাতে। আমরা বলব যে

==========

ছেলের বিয়ে হয় আট তারিখে, যে এগারো তারিখ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে— সে কি ঢাকায় কোনো লোককে খুন করতে পারে ? তুই বল পারে ?

না।

এই তো পথে আসছিস। তুর্না নিশিথিনী ট্রেনের ফার্স্টক্লাস এসি কামরার দু'টা ব্যাক ডেটের টিকিট জোগাড় হয়েছে। সঞ্জুর নামে টিকিট ইস্যু হয়েছে।

ও।

চিটাগাং-এ যে হোটেলে ছিল সেই হোটেলে ব্যাক ডেটে বুকিং স্লিপ হয়েছে। কক্সবাজারে হয়েছে। মিরপুরের উৎসব কমিউনিটি সেন্টারে ব্যাক ডেটে বুকিং স্লিপ আছে।

ও।

বাকি আছে শুধু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাবিননামা। একটু ঝামেলা হচ্ছে— তবে সন্ধ্যা নাগাদ খবর পেয়ে যাব যে এটাও কমপ্লিট। এইসব কাজ আমি খুব অল্প পয়সায় সেরেছি। মাত্র সাড়ে তের হাজার খরচ হয়েছে। কাজি অফিসের কাবিননামাটায় বেশি লাগবে। মিনিমাম দশ হাজার ধরে রাখ।

মিথ্যা বিয়ে ?

মিথ্যা হবে কেন ? সত্যি সত্যি বিয়ে। কনক মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে। একটু ব্যাক ডেটে হচ্ছে। সেটা কারোর জানার তো দরকার নেই। আমরা কাজি অফিসে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেব। তারিখটা বসানো হবে পিছনের। ক্লিয়ার ?

সঞ্জু রাজি হবে না।

রাজি হবে না কেন ?

কনক মেয়েটাকে সে পছন্দ করে না।

সালু মামা থমথমে গলায় বললেন, ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচার জন্যে আমি যদি পথ থেকে একটা নেড়ি কুত্তি ধরে এনে শাড়ি পরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি সঞ্জু একে বিয়ে করতে হবে, সঞ্জু সোনামুখ করে বলবে— কবুল কবুল কবুল।

চিকেন কাটলেট এবং ভেজিটেবল প্যাকোরা চলে এসেছে। সালু মামা চিকেন কাটলেটে একটা কামড় দিয়ে বললেন— জিনিস খারাপ না। ঝাল একটু বেশি, কিন্তু ঝালটার প্রয়োজন ছিল। তুই কিছু খাবি না ?

না।

পাথরের মতো মুখ বানিয়ে ফেলেছিস কী জন্যে ? তুই কি ভেবেছিস সঞ্জুর সঙ্গে কথা না বলে আমি এগিয়েছি ? ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

সঞ্জু রাজি ?

==========

অবশ্যই রাজি। আমি ইস্তিয়াক সাহেবের সঙ্গে এই প্ল্যান নিয়ে কথা বলেছি। উনি আমার প্ল্যানে মুগ্ধ। তবে তিনি বলেছেন এই মুহূর্তে যেন মকবুল হোসেন কিছু না জানেন। আমরা পুরো ব্যাপারটা পুরোপুরি গুছিয়ে রাখব। খেলার জন্যে যে সব তাস দরকার সব হাতে থাকবে। প্রয়োজন হলে শেষ মুহূর্তে মকবুল হোসেনকে আমাদের তাস দেখাব। ব্যাটার চোখ শুধু যে কপালে উঠবে তা-না, মাথার তালুতে উঠে যাবে। এখন বল আমার বুদ্ধি কেমন ?

মামা তোমার বুদ্ধি ভালো।

সালু মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বুদ্ধি শুধু ভালো বললে বুদ্ধির অপমান করা হয়। আমার অতিরিক্ত বুদ্ধি। অতিরিক্ত বুদ্ধির কারণে নিজের জন্যে কিছু করতে পারলাম না। তুই এক কাজ কর, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নে। আজ আমার সঙ্গে থাকবি।

কেন ?

অনেক কাজ বাকি আছে। ব্যাক ডেটে বিয়ের কার্ড ছাপতে দেব। এই কার্ড বিলি করবার দরকার নেই— কিছু স্যাম্পল থাকবে। কাজির অফিসে যাব। আমার যে বন্ধু কাজি অফিসের ব্যাপারটা দেখছে তার বাসায় রাতে আমার দাওয়াত। তুইও থাকবি। মামার সঙ্গে ঘুরবি, কোনো সমস্যা আছে ?

না।

আমার ঐ বন্ধুর আবার সামান্য মদ্য পানের অভ্যাস আছে— ওর জন্যে দু'টা ব্ল্যাক লেভেল কিনতে হবে। আমার দিক থেকে উপহার। এত বড় একটা কাজ করে দিচ্ছে। বুঝতেই পারছিস। বুঝতে পারছিস না ?

ফরহাদ উদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন, পারছি।

সঞ্জুকে নিয়ে ভাবিস না। বেলাইনে চলে যাওয়া ছেলেপুলেকে লাইনে তুলতে হয় বিয়ে দিয়ে। এক দেড় বছর স্ত্রীর সঙ্গে লটর-পটর করতে করতেই পার হয়ে যায়— তারপর সংসারে ছেলে-মেয়ে চলে আসে, তখন আর যাবে কোথায় ? ঠিক বলেছি কি-না বল।

হুঁ।

টাকার ব্যবস্থা করেছিস ?

কী টাকা ?

লাখ দুই টাকা লাগবে বলেছিলাম না ? মকবুলকে আজ কালের ভিতর দিয়ে দিতে হবে। আমি যে প্যাঁচ খেলেছি তাতে অল্পের ওপর দিয়ে যাবে। মকবুলের ডিমান্ড ছিল ফাইভ।

==========

ও।

চিমশা মেরে থাকিব না তো। বি হ্যাপী। কনক মেয়েটাকেও তো বিয়েতে রাজি করাতে হবে। তুই করবি না আমি করব ?

ফরহাদ উদ্দিন জবাব দিলেন না।

সালু মামা বললেন, তুই বল। তুই বললেই হবে। এখন যা বাসায়। একটা টেলিফোন কর, তারপর চল বের হই।

বাসায় টেলিফোন করব কেন ?

ফিরতে দেরি হবে এটা জানিয়ে দে। নয়তো দুশ্চিন্তা করবে।

ফিরতে দেরি হবে কেন ?

আরে এতক্ষণ কী বললাম— নানান কাজ কর্ম আছে। রাতে বন্ধুর বাসায় যাব। সেখানে রাত হবে। যা, চট করে টেলিফোনটা করে আয়; আমি আরেক কাপ চা খাই। আজকের চা-টা ঐ দিনের মতো হয় নাই।

ফরহাদ উদ্দিন টেলিফোন করার জন্যে নিজের ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোন ধরল কনক। মেয়েটার গলার স্বর টেলিফোনে এত মিষ্টি শুনাচ্ছে!

কেমন আছ গো মা ?

চাচাজি আমি ভালো আছি।

কলেজে যাও নি ?

কলেজ তো এখন বন্ধ। সামারের ছুটি। আপনাকে আগে বলেছি।

মনে থাকে না মা। কিছুই মনে থাকে না।

আপনার গলার স্বর এমন শুনাচ্ছে কেন চাচাজি ? আপনার শরীর কি ভালো ?

আমার শরীর ভালো। তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে।

কী সুসংবাদ ?

আসলে সুসংবাদ দু'টা। একটা এখন বলি। আরেকটা পরে বলব। সামনা সামনি বসে বলব।

না চাচাজি, দু'টাই এখন শুনব।

প্রথম সুসংবাদ হলো— তোমার মা'র ঠিকানা বের করেছি। এখন আর যোগাযোগ করতে অসুবিধা হবে না।

যে যোগাযোগ করতে চায় না তার সঙ্গে যোগাযোগ করা কি ঠিক ? দু'নম্বর সুসংবাদটা কী ?

==========

সঞ্জু তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। কী মা খুশি ?

কনক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চাচাজি আপনি খুশি হলেই আমি খুশি।

এই বাড়িতেই থাকবে। কোথাও চলে যেতে হবে না। বদরুল এসে দেখবে তার মেয়ে আমার কাছেই আছে। সে কী খুশিই না হবে!

বাবা আসবে মানে ?

ফরহাদ উদ্দিন গলার স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন— কনক শোন, আমার মনের সব ইচ্ছা একে একে পূর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে। কুড়ি বছর পার হতে বেশি বাকি নেই তো— এই জন্যেই ঘটনাটা ঘটছে। আমার ইচ্ছা ছিল সঞ্জুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়া— সেটা হচ্ছে। ঘ্রাণশক্তি যেন ফিরে পাই এই ইচ্ছাটাও ছিল। হঠাৎ হঠাৎ ঘ্রাণ পাচ্ছি। সালু মামা চিকেন কাটলেট খাচ্ছিল। চিকেন কাটলেটের সঙ্গে সস, কাঁচামরিচ আর পিঁয়াজ দিয়েছে। সালু মামা যেই একটা কাঁচামরিচে কামড় দিলেন ওমনি কাঁচামরিচের ঘ্রাণ পেলাম।

চাচাজি আপনার শরীর কি ভালো ?

হ্যাঁ শরীর ভালো।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার শরীর ভালো না। আপনি এক কাজ করুন। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় চলে আসুন।

অফিস থেকে ছুটি নিব কিন্তু বাসায় আসতে দেরি হবে রে মা। অনেক কাজ বাকি। তোমাদের বিয়ের কার্ড ছাপতে দিতে হবে। আজ দিনে দিনে কার্ড ছাপায়ে বাসায় নিয়ে আসব।

চাচাজি বিয়েটা কবে ?

এইখানে একটা মজা আছে রে মা। বিরাট মজা।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলেমানুষের মতো কুই কুই করে হাসছেন। কনক হ্যালো হ্যালো বলছে তিনি তা শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর খুবই হাসি পাচ্ছে।

ফরহাদ উদ্দিন বাড়ি ফিরলেন রাত তিনটায়।

দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে সবাই জেগে বসে আছে। মানুষটা এত রাত করে কখনো ফিরে না। কোনো একসিডেন্ট হয় নি তো ? বাড়ি ফিরতে দেরি হবে এই খবর টেলিফোনে কনককে জানানো হয়েছে। সেই দেরি মানে এত দেরি ? রাত আড়াইটার সময় সঞ্জু বের হয়েছে হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নিতে।

==========

রাহেলা নফল নামাজ পড়তে বসেছেন। কলিং বেলে শব্দ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাজ ছেড়ে উঠবেন না।

কলিং বেল বাজতেই তিনি নামাজ ছেড়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। ফরহাদ উদ্দিন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ দিয়ে ভকভক করে দুর্গন্ধ আসছে। তিনি সহজভাবে দাঁড়াতেও পারছেন না।

রাহেলা আতঙ্কিত গলায় বললেন, কী হয়েছে ?

ফরহাদ উদ্দিন হাসিমুখে বললেন, তেমন কিছু না। মদ খেয়েছি। একটা বিয়ার খেয়েছি। আর দুই গ্লাস হুইস্কি।

রাহেলা স্বামীর হাত ধরলেন। মেয়েরা চোখ বড় বড় করে বাপকে দেখছে। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তারা আগে কখনো দেখে নি। ফরহাদ উদ্দিন মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন— সঞ্জুর বিয়ের কার্ড ছাপতে দিয়ে এসেছি। চারদিকে রুপালি বর্ডার। কাল সকালে ডেলিভারী দিবে।

রাহেলা বললেন, কথা বলতে হবে না। এসো বিছানায় শুয়ে পড়। কথা যা বলার সকালে বলবে।

ফরহাদ উদ্দিন সাহেবের রাতে খুব গাঢ় ঘুম হলো। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলেন বদরুলকে। বদরুলের মুখ ভর্তি হাসি। বদরুল বলল, আমার মেয়েটার বিয়ে ঠিক করলি— আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে!

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তোর ছেলে পছন্দ হয়েছে তো ?

বদরুল বলল, সঞ্জুর মতো ছেলে পছন্দ হবে না মানে ? এরকম ছেলে কি পথেঘাটে পাওয়া যায় ?

তুই খুশি তো ?

অবশ্যই খুশি।

খুব আয়োজন করে বিয়েটা দিতে পারছি না। ব্যাক ডেটে বিয়ে হচ্ছে। তুই কিছু মনে করিস না।

যেভাবে সুবিধা তুই সেভাবে দে।

বিয়ের কার্ড আগামীকাল দিবে। কার্ড বেশি ছাপানো হয় নি। অল্প ছাপানো হয়েছে। তুই তো নিখোঁজ হয়ে আছিস। তোকে কার্ড কীভাবে পৌঁছাব ?

আমাকে নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। তুই আরাম করে ঘুমো। আমি তোর মাথার চুল টেনে দিচ্ছি।

==========

স্বপ্নে বদরুল তাঁর চুল টেনে দিতে থাকল। তিনি আবারো স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

==========

সঞ্জুর বিয়ের কার্ড ফরহাদ উদ্দিনের খুবই পছন্দ হয়েছে। রুপালি বর্ডার দেওয়া কার্ড। লেখাগুলি সবুজ। চিঠির ভাষাটাও সুন্দর। সালু মামা সুন্দর করে সব সাজিয়েছেন।

পরম করুণাময়ের নামে শুরু

সুধী,

আসসালামু আলায়কুম। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমার একমাত্র পুত্র আশরাফ উদ্দিন সঞ্জুর শুভ বিবাহের তারিখ ...

কার্ডের উল্টো পিঠে বরের পরিচয় কনের পরিচয়। বরযাত্রার সময়। এবং সবশেষে লেখা—

উপহার আনিবেন না। আপনার দোয়াই কাম্য।

সব কিছুই ঠিক আছে শুধু বিয়ের তারিখটা যেন কেমন। এই একটা জায়গায় খটকা। আর কোথাও কোনো খটকা নেই। তারিখের খটকাটা না থাকলে ফরহাদ উদ্দিন তাঁর অফিসের কলিগদের সবাইকে একটা করে কার্ড দিতেন।

যে রিকশাওয়ালা তাঁকে চা বিসকিট খাইয়েছিল তাকে যে করেই হোক খুঁজে বের করে তাকেও একটা কার্ড দিতেন। আর একটা কার্ড পাঠাতেন অস্ট্রেলিয়ায়। বদরুল পাশাকেও একটা কার্ড পাঠাতেন। কার্ডের ওপরে লিখতেন বদরুল পাশা। ঠিকানার জায়গায় লিখতেন— ঠিকানা অজানা। তারপর সেই কার্ড পোস্টাফিসের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসতেন। কার্ড বদরুলের কাছে পৌছত না। তাতে কী ? মনের একটা শান্তি। মনের শান্তি খুবই জরুরি জিনিস।

সালু মামা বারবার বলে দিয়েছেন কার্ডগুলি লুকিয়ে রাখতে যেন কারো চোখে না পড়ে। ফরহাদউদ্দিন তাই করেছেন। সব কার্ড অফিসের ড্রয়ারে

==========

তালাবন্ধ আছে। একটা কার্ড শুধু আলাদা করে রেখেছেন। এই কার্ডটা পৌঁছাতে হবে। তিনি ঠিক করেছেন সঞ্জুকে সঙ্গে নিয়েই এই কার্ড পৌঁছাবেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্ড বরকে সঙ্গে নিয়ে বিলি করতে হয়।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্যটা বলেন নি। ঘর থেকে বের হয়ে বলবেন।

বাবা ডেকেছ ?

ফরহাদ উদ্দিন ছেলের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সঞ্জু হালকা হলুদ রঙের একটা শার্ট পরেছে। সার্টটায় তাকে এত মানিয়েছে! শার্টের হলুদ রঙের আভা পড়েছে চুলে। চুলগুলি মনে হচ্ছে সোনালি। ফরহাদ উদ্দিন গলা নামিয়ে বললেন, তোর বিয়ের কার্ড দেখেছিস ? তারিখটা শুধু ইয়ে হয়ে গেল। আর সবই ভালো ছিল। হাতে নিয়ে দেখ।

সঞ্জু বিরক্ত মুখে বলল, কার্ড দেখার জন্য ডেকেছ ? দেখার দরকার নেই।

নিজের বিয়ের কার্ড নিজে দেখবি না এটা কেমন কথা ? তোর শ্বশুরের নামের বানানে ভুল ছিল। বদরুল পাশার জায়গায় লিখেছে বদরুল পাসা। আমি কলম দিয়ে ঠিক করে দিয়েছি।

সঞ্জু নিঃশ্বাস ফেলল। ফরহাদ উদ্দিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, চল যাই।

সঞ্জু বলল, কোথায় যাব ?

জরুরি একটা কাজে যাব। খুবই জরুরি। যাব আর আসব। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

কোথায় যাবে বলো ?

এত কথা বলাবলির দরকার কী ? বাবার সঙ্গে যাবি সমস্যা তো কিছু নেই।

দুপুরে আমার খুব জরুরি কাজ আছে বাবা।

আরে বোকা তোকে কী বললাম, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। প্রথম গলিটা পার হয়ে দ্বিতীয় গলির মোড়ে থমকে দাঁড়ালেন। সঞ্জু বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, হাসনাত সাহেবের বাসায়।

কার বাসায় ?

হাসনাত সাহেবের বাসায়। সানসাইন ভিডিওর মালিকের বাসায়।

কেন ?

==========

উনি তো আর বেঁচে নেই। উনার স্ত্রীর হাতে তোর বিয়ের একটা কার্ড দেব। হাসনাত সাহেব মারা না গেলে তো আর বিয়েটা হতো না। উনি মারা গেছেন বলেই তো সব জট পাকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে। ফাঁকতালে তোর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। একটা কার্ড তাদের প্রাপ্য।

সঞ্জু তীক্ষ্ণ চোখে বাবার দিকে তাকাল। ফরহাদ উদ্দিন বললেন, এটা একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা। সৌজন্যবোধ। চল যাই।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলের হাত ধরলেন। সঞ্জু বলল, বাবা তোমার মাথা যে এলোমেলো হয়ে গেছে এটা তুমি জানো ?

ফরহাদ উদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন, মাথা এলোমেলো হবে কেন ? স্মৃতি শক্তির সামান্য সমস্যা হচ্ছে। এটা ছাড়া মাথার বরং উন্নতি হয়েছে। এখন মাঝে মাঝে ঘ্রাণ পাচ্ছি। তুই সেন্ট মেখেছিস। তোর গা থেকে সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি। এখন তুই খুব ঘামছিস— এখন সেন্টের গন্ধ ছাপিয়ে ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। তুই এত ঘামছিস কেন ? ভয় পাচ্ছিস না-কি ?

ভয় পাব কেন ?

তুই তো খুবই ভয় পাচ্ছিস। ভয়ে তোর গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গেছে।

সঞ্জু বলল, বাবা হাত ছাড়।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, তোর হাত আমি ছাড়ব না। হাসনাত সাহেবের স্ত্রীর কাছে আমি তোকে নিয়ে যাব। তুই খুবই ভদ্রভাবে তাঁর হাতে কার্ডটা দিবি। এটা ছাড়া তোর গতিও নেই।

সঞ্জু বলল, গতি নেই মানে কী ?

গতি নেই তার কারণ এখন আমার ইচ্ছামতো সব হবে।

কী বলছ হাবিজাবি!

ফরহাদ উদ্দিন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন— তোকে বুঝিয়ে বলছি মন দিয়ে শোন। সত্যি কথা বলার যে সাধনাটা শুরু করেছিলাম সেটা কাজে লেগে গেছে। যা ইচ্ছা করছি তাই দেখি এখন হচ্ছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হলো— প্রচণ্ড গরম পড়েছে, নাশতা হিসেবে পান্তা ভাত খেলে মন্দ হতো না। তারপর কী হয়েছে শোন— নাশতার টেবিলে গিয়ে বসেছি। রাহেলা বলল, গত রাতে মেয়েরা কেউ ভাত খায় নি। ভাতে পানি দিয়ে রেখেছি। ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা খাবে ? মজা করে পান্তা খেলাম।

সঞ্জু বলল, বাবা হাতটা একটু ছাড়। আমার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ফরহাদ উদ্দিন মনে হলো ছেলের কথা শুনতে পেলেন না। তিনি আগের

==========

কথার খেই ধরে নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন— বুঝলি সঞ্জু, খুবই অবাক লাগছে। যেটা ইচ্ছা করছি তাই হচ্ছে। এই যে দেখ আমি ইচ্ছা করলাম তোকে নিয়ে হাসনাত সাহেবের স্ত্রীর কাছে যাব— তাই কিন্তু যাচ্ছি। হাজার চেষ্টা করেও তুই এটা বন্ধ করতে পারবি না।

সঞ্জু বলল, বাবা তুমি হঠাৎ এটা কী শুরু করলে। চিনি না জানি না তাকে বিয়ের কার্ড দিতে যাব কেন ?

হাসনাত সাহেবের স্ত্রীকে না চিনলেও হাসনাত সাহেবকে তো চিনিস।

আমি তোমাকে বলেছি হাসনাত নামের কাউকে আমি চিনি না। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না ?

আগে বিশ্বাস করেছিলাম এখন করছি না। সত্য কথা বলার সাধনার আরেকটা উপকারিতা হলো— কেউ তখন আমার সঙ্গে মিথ্যা বললে আমি ধরে ফেলতে পারি। তোর কোনো উপায় নেই সঞ্জু। তোকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

সঞ্জু বাবার চোখের দিকে তাকাল। ফরহাদ উদ্দিনের মুখ শান্ত। উত্তেজনাহীন সহজ স্বাভাবিক মুখ। তিনি প্রায় অস্পষ্ট শব্দে বিড়বিড় করেও কী যেন বললেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে অভয়দানের মতো করে হাসলেন। সঞ্জু বলল, বাবা একটা রিকশা ডাক। আমাকে থানায় নিয়ে চল। আমি সব স্বীকার করব। আর হাতটা ছাড় বাবা— ব্যথা পাচ্ছি।

ফরহাদ উদ্দিন ছেলের হাত ছেড়ে দিলেন।

আকাশে ঝলমলে রোদ।

রোদ গায়ে লাগছে না, কারণ প্রচুর বাতাস। বাতাসে সঞ্জুর চুল উড়ছে। রোদ পড়ায় চুলগুলি এখন আরো সোনালি লাগছে। ফরহাদ উদ্দিন যতটা সম্ভব এক পাশে সরে বসেছেন। গরমের সময় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলে সঞ্জুর ভালো লাগে না।

সঞ্জু বলল, বাবা ঠিকমতো বস তো। এরকম হেলে বসে আছ কেন ?

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, গায়ের সঙ্গে গা লাগলে তোর তো আবার গরম লাগে।

সঞ্জু বলল, তুমি আরাম করে বোস। আমার গরম লাগছে না।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, এ জার্নি বাই রিকশা কেমন লাগছেরে ব্যাটা ?

সঞ্জু জবাব দিল না। হাসল। ফরহাদ উদ্দিনের খুব ইচ্ছা করছে ছেলের হাত

ধরতে। সাহসে কুলুচ্ছে না। গায়ে হাত দিলে সঞ্জু খুব রাগ করে। ফরহাদ উদ্দিনকে অবাক করে দিয়ে সঞ্জু বাবার হাত ধরল।

ফরহাদ উদ্দিন বললেন, একটা ধাঁধা তোকে জিজ্ঞেস করছি দেখি জবাব দিতে পারিস কি না—

আকাশে জন্মে কন্যা
পাতালে মরে
হাত দিয়া ধরতে গেলে
ছটর ফটর করে।

সঞ্জু বলল, উত্তর জানি না বাবা।

তোর মা রোজ ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। আমি কোনোটার উত্তর দিতে পারি নি। সে নিজেও উত্তর দিত না। উত্তর জিজ্ঞেস করলে হাসত। আমি করতাম রাগ।

সঞ্জু বলল, বাবা আমার ধারণা মা উত্তর জানত না। নিজে বানিয়ে বানিয়ে ধাঁধা বলত— যার কোনো উত্তর নেই।

হতে পারে। আমি এইভাবে চিন্তা করি নি।

সঞ্জু বলল, কাঁদছ কেন বাবা? কাঁদবে না।

ফরহাদ উদ্দিন চোখের পানি মুছে ফেলতে চাচ্ছেন কিন্তু পারছেন না। তাঁর ডান হাত সঞ্জু ধরে আছে। চোখের পানি মুছতে হলে বাঁ হাত দিয়ে মুছতে হয়। বাঁ হাত দিয়ে চোখের পানি মুছা খুবই অমঙ্গলজনক। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রিকশা করে যাচ্ছেন এমন মঙ্গলময় মুহূর্তে অমঙ্গল হয় এমন কাজ করা সম্ভব না।

সঞ্জু বলল, বাবা তোমার সত্য সাধনা কবে যেন শেষ হবে।

ফরহাদ উদ্দিন আগ্রহের সঙ্গে বললেন, বেশি বাকি নেই, ডিসেম্বরের তিন তারিখ।

খুবই কাকতালীয়ভাবে সঞ্জুর ফাঁসি হয় ডিসেম্বরের তিন তারিখ।

ফরহাদ উদ্দিন অপেক্ষা করতে থাকেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনে। ছেলের ডেডবডি তাকে দিয়ে দেয়া হবে ভোর ছটায়। তিনি ডেডবডি নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের একটা গাড়িকে খবর দেয়া আছে। সেই গাড়ি এখনো আসে নি। গাড়ি না এলে ডেডবডি নেয়া সমস্যা হবে।

সেদিন গাঢ় কুয়াশা পড়েছিল। এমন কুয়াশা যে চারদিকের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সূর্য অনেক আগেই উঠে গেছে কিন্তু সূর্যের কোনো আলো শহরে

এসে ঢুকছে না, বরং কুয়াশা গাঢ় হচ্ছে। খুব কাছের মানুষকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ফরহাদ উদ্দিনের মনে হলো দূরে কাকে যেন দেখা যাচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিটা বদরুল পাশার মতো। লম্বা একজন মানুষ হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বদরুলের মতোই হাঁটছে। আজ তাঁর ইচ্ছা পূরণের দিন। বদরুলের সঙ্গে আবার যেন দেখা হয় এই ইচ্ছাটা কি পূর্ণ হতে যাচ্ছে ?

ফরহাদ উদ্দিন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। যে আসছে সে আসুক। মানুষটা যদি বদরুল হয় ভালোই হয়। ডেডবডি বাড়িতে নিয়ে যাবার মতো ঝামেলার কাজে সে সাহায্য করতে পারে। আর বদরুল না হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

ছ'টা বেজে গেছে। জেলখানার মূল ফটক খোলার শব্দ হচ্ছে। মনে হয় এরা এখন সঞ্জুকে নিয়ে আসছে।

For more book free download go to www.missabook.com

For more book free download go to www.missabook.com